বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কঃ ১৯৯১-২০০১ সময়কালের উপর একটি সমীক্ষা

গবেষকঃ
মোঃ আলী আজম খান
রেজিঃ নং-১০৯, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৩-২০১৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়কঃ
(ক) ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়কঃ
(খ) ড. সাব্বীর আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কঃ ১৯৯১-২০০১ সময়কালের উপর একটি সমীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত

গবেষকঃ

মোঃ আলী আজম খান

রেজিঃ নং-১০৯, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৩-২০১৪

তত্ত্বাবধায়কঃ

(ক) ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়কঃ

(খ) ড. সাব্বীর আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক: ১৯৯১-২০০১ সময়কালের উপর একটি সমীক্ষা

পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের প্রয়োজনীয় চাহিদার আংশিক পরিপূরক হিসেবে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

(মোঃ আলী আজম খান)
রেজিস্ট্রেশন নং- ১০৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুমোদন পত্র

মোঃ আলী আজম খান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য দাখিলকৃত **বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক: ১৯৯১-২০০১ সময়কালের উপর একটি সমীক্ষা** গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমরা প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি আমরা পাঠ করেছি এবং এর মৌলিকতা ও উৎকর্ষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

ড. সাব্বীর আহমেদ
তত্ত্বাবধায়ক
এবং
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক
এবং
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার সময় আমি অনেকের সহযোগিতা ও মূল্যবান উপদেশ এবং পরামর্শ পেয়েছি। প্রথমেই আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. সাব্বীর আহমেদ স্যারকে। যিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধান করে আমাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন। আমি সে জন্য তার প্রতি গভীর কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার গবেষণা কর্মের যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন স্যারের প্রতি। তিনি প্রতিনিয়ত আমার গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ে খবর নিয়েছেন এবং দিক-নির্দেশনা, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বেপারী, অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, সহকারী অধ্যাপক জনাব কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এবং সহকারী অধ্যাপক জনাব মামুন আল মোস্তফাসহ বিভাগের অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলীর মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জাতীয় সংসদ সবিচালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কেন্দায় পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ডেমোক্রেসী ওয়াচ লাইব্রেরী, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, এন.ডি.আই. লাইব্রেরী, ইউনেস্কো লাইব্রেরী, টি.আই.বি. লাইব্রেরী ও গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য। গবেষণা কর্মে যেসব লেখক ও তাত্ত্বিকের রচিত বইপত্র, জার্নাল ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাদের কাছেও আমি ঋণী।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কানাডা প্রবাসী জনাব মোঃ লিয়াকত আলী খানের প্রতি। তিনি আমার গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ে খোজ-খবর নিয়েছেন এবং উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। গবেষণা কর্ম কম্পিউটার কম্পোজে সহযোগিতা করার জন্য জনাব মোঃ বসির আহমেদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গবেষণা কর্মে আরও অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের নাম এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। এই অনুল্লেখিত ব্যক্তিদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার মা আছিয়া খাতুনের নিকট। যিনি আমাকে সার্বক্ষণিক শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার অগ্রজ সহোদর মোঃ লিয়াকত আলী খানের নিকট। তিনি আমাকে মূল্যবান উপদেশ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহায়তা প্রদান করেছেন। গবেষণাকালীন সময়ে খানিকটা পিতৃ স্নেহ বঞ্চিত আইমান এর কাছেও আমি ঋণী। সর্বোপরি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা আমার প্রকাশ করছি আমার সহধর্মিনী ইশরাত জাহান ইমুর নিকট যার ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ব্যতীত গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

(মোঃ আলী আজম খান)
রেজিস্ট্রেশন নং- ১০৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার ভূমিকা এখনও আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে না। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় সংসদ গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণে যথাযথভাবে কার্যকর নয়। ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হলেও ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়। ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলন পরবর্তীকালে ১৯৯১ সালে গঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হলে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায়। পঞ্চম সংসদের শুরুতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেলেও একই সংসদে তাদের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক হয়ে উঠে। এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের ধরন বিশ্লেষণ করা। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এই সম্পর্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সময়কালে মাগুরা ২ আসনের উপনির্বাচনে সরকারি দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হলে বিরোধী দল ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত করার দাবী জানায়। এই দাবীর প্রেক্ষিতে সংসদ অধিবেশন থেকে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউট বয়কট পর্যন্ত গড়ায়। সর্বশেষ বিরোধী দল ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটিও উভয় দলের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করে। যদিও অনাস্থা প্রস্তাবটি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদেও সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধিতামূলক সম্পর্কের ধারা অব্যাহত থাকে। সপ্তম সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিল, ইমডেমনিটি পাবলিক সেফটি বিল, অর্ডিন্যান্স রিপিল বিল, স্থানীয় সরকার বিল, কমিটি ব্যবস্থা বিল ইত্যাদি বিলে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সীমিত বা শূন্য ছিল। প্লেনারি সেশনে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে। সংসদে কথা বলতে দেওয়া হয় না। এই অভিযোগে পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দল সংসদ অধিবেশন থেকে ৭৬ বার ওয়াক আউট করে। অপরদিকে সপ্তম সংসদের বিরোধী দল একই কারণে ৬১ বার ওয়াক আউট করে। সংসদীয়

গণতন্ত্রে বিরোধী দল কর্তৃক যৌক্তিক কারণবশত ওয়াক আউট একটি স্বাভাবিক সংসদীয় রীতি। সপ্তম সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক অতিরিক্ত ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটলেও সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় সংসদে সরকারি ও বেসরকারি বিল, জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মূলতবি প্রস্তাব এবং বিলের সংশোধনীসমূহ সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে গৃহীত না হওয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধিতামূলক সম্পর্ক ত্বরান্বিত হয়েছে। এছাড়া, বিরোধী দল সংসদীয় কার্যক্রমে গঠনমূলক বিরোধাতার পরিবর্তে প্রতিনিয়ত বিরোধীতার স্বার্থে বিরোধীতা করেছে। বিরোধী দলের এরূপ বিরোধীতায় সব কিছুতেই বিরোধীতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক ও বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক সংসদের কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

উল্লেখিত পটভূমিতে জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য গবেষণা কর্মটিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত পেশাজীবী শ্রেণী আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাদের মধ্যে হতে নির্বাচিত ১০০ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নমালার আলোকে মতামত জরিপের মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়। মাধ্যমিক উৎসে বিভিন্ন গবেষকের প্রকাশিত বই, বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সংসদ বিতর্ক, জার্নাল, পত্র-পত্রিকায় ব্যবহৃত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে পাঠাগারে অধ্যয়ন, সংসদ অধিবেশন পর্যবেক্ষণ, সংসদের ভেতরে সংসদ সদস্যদের আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজস্ব অভিজ্ঞতা সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধীতামূলক সম্পর্কের কারণে জাতীয় সংসদ অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বিরোধাতা জাতীয় সংসদের বাইরে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
৩.১	বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৮৬২-১৯৪৫	৫৪
৩.২	বঙ্গীয় আইনসভার ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ফলাফল	৫৭
৩.৩	বঙ্গীয় আইনসভার ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী ফলাফল	৫৮
৩.৪	পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের দল ও আসন সংখ্যা	৬১
৩.৫	১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল	৬৩
৩.৬	সংসদে সময় বণ্টনের শতকরা হার	৬৪
৩.৭	পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ	৬৬
৩.৮	পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৬৮
৩.৯	পশ্চিম পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৬৯
৩.১০	পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৭০
৪.১	১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল	৭৮
৪.২	১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল	৮২
৪.৩	১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল	৮৪
৪.৪	১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল	৯২
৪.৫	১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল	৯৫
৫.১	১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল	১০৬
৫.২	পঞ্চম জাতীয় সংসদের আর্থিক কার্যাবলী (বিধি ১১১-১২৯)	১১১
৫.৩	পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব (বিধি-৪১-৫৮)	১১২
৫.৪	পঞ্চম জাতীয় সংসদে স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন (বিধি-৫৯)	১১৪
৫.৫	পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৩টি অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত মূলতবী প্রস্তাবের তালিকা	১১৬
৬.১	১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল	১২৭
৬.২	পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারি ও বেসরকারি বিলের পরিসংখ্যানভিত্তিক চিত্র	১২৯
৬.৩	সপ্তম জাতীয় সংসদের তদারকিমূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি	১৩০
৬.৪	প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি-৬৮)	১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫	পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের ওয়াকআউটের চিত্র	১৩৭
৬.৬	বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ অধিবেশন বর্জন ১৯৯১-২০০১	১৩৮
৬.৭	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি	১৪৩
৬.৮	জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতির হার	১৪৪
৮.১	পঞ্চম থেকে সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত ও পেশাগত অবস্থানের তুলনামূলক চিত্র	১৮৮
৮.২	সংসদ সদস্যদের সংসদীয় অভিজ্ঞাতার তুলনামূলক চিত্র	১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
৭.১	উত্তরদাতাদের বয়স সীমা	১৫২
৭.২	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৫৩
৭.৩	উত্তরদাতাদের ধর্ম	১৫৪
৭.৪	উত্তরদাতাদের পেশা	১৫৫
৭.৫	সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও বিরোধপূর্ণ	১৫৬
৭.৬	সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সহনশীলতাপূর্ণ নয়	১৫৭
৭.৭	সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর দলীয় মতাদর্শের প্রভাব রয়েছে	১৫৮
৭.৮	দলীয় কার্যক্রমে গণতন্ত্রের চর্চা	১৫৯
৭.৯	সরকার ও বিরোধী দলের যথাযথ ভূমিকার মাধ্যমে সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে পারে	১৬০
৭.১০	অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি	১৬১
৭.১১	হরতাল-অবরোধ প্রত্যাহার করা উচিৎ	১৬২
৭.১২	হরতাল-অবরোধের বিকল্প হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও ও মানব বন্ধন সমর্থন	১৬৩
৭.১৩	সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন	১৬৪
৭.১৪	বিরোধী দল তাদের কর্মসূচী সফল করার জন্য সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন করতে পারে	১৬৫
৭.১৫	রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে	১৬৬
৭.১৬	সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে পেশাগত বিষয়ে সমস্যা	১৬৭
৭.১৭	অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে ব্যবসার ক্ষতি	১৬৮
৭.১৮	রাজনৈতিক সহিংসতা থাকলে নাগরিকরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে না	১৬৯
৭.১৯	শহরকেন্দ্রিক বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারণে দু:চিন্তা	১৭০
৭.২০	হরতাল-অবরোধ চলাকালে নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ	১৭১
৭.২১	হরতাল-অবরোধ চলাকালে জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা	১৭২
৭.২২	সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দলের ভূমিকার প্রয়োজন	১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

এনডিএফ	:	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
DAC	:	Democratic Action Committee
পিপিপি	:	পাকিস্তান পিপ্‌লস পার্টি
পিডিপি	:	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি
AL	:	Awami League
বিএনপি	:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
সিপিবি	:	কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ
ইউপিপি	:	ইউনাইটেড পিপ্‌লস পার্টি
এমএল	:	মুসলিম লীগ
আইডিএল	:	ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ
জাগদল	:	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল
BBC	:	British Broadcasting Corporation
VOA	:	Voices of America
জাসদ	:	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
এনডিপি	:	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
SAARC	:	South Asian Association for Regional Cooperation
FEMA	:	Fair Election Monitoring Alliance
বাসদ	:	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল
JBPA	:	Japan Bangladesh Parliamentary Association
SPD	:	Strengthening Parliamentary Democracy
ইপিআর	:	ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স
NDI	:	National Democratic Institute
ন্যাপ	:	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
বঙ্গীয় আইন-সভা	:	Bengal Legislative Council
কার্য উপদেষ্টা কমিটি	:	Business Advisory Committee
সংসদের কার্য-প্রণালী	:	Business of the House
উপ-নির্বাচন	:	By-Election
মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার	:	Cabinet Government
তত্ত্বাবধায়ক সরকার	:	Care-Taker Government
বিতর্ক	:	Debate

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধঘণ্টা আলোচনা	:	Half-an-Hour Discussion
অনুগত বিরোধী দল	:	Loyal Opposition
সংসদ সদস্য	:	Member of Parliament
মুলতবি প্রস্তাব	:	Motion of Adjournment
অনাস্থা প্রস্তাব	:	No Confidence Motion
বেসরকারি সদস্য	:	Private Member
অধ্যাদেশ	:	Ordinance
সংসদীয় সার্বভৌমত্ব	:	Parliamentary Sovereignty
পিটিশন অব রাইট	:	Petition of Right
প্রস্তাবনা	:	Preamble
বেসরকারী সদস্য বিল	:	Private Members Bill
সরকারি হিসাব কমিটি	:	Public Accounts Committee (PAC)
জনগুরুত্বপূর্ণ	:	Public Importance
স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	:	Question of Short Notice
তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন	:	Question Upon Star Mark
তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্ন	:	Question without Star Mark
কোরাম	:	Quorum
গণভোট	:	Referendum
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	:	Resolution
সার্জেন্ট-এট-আর্মস	:	Sergeant-at-Arms
ছায়া মন্ত্রিসভা	:	Shadow Cabinet
স্পীকারের সিদ্ধান্ত	:	Speakers Ruling
স্থায়ী কমিটি	:	Standing Committee
অনাস্থা ভোট	:	Vote of No Confidence
ওয়াক আউট	:	Walkout
ওয়েস্টমিনস্টার	:	Westminster
সম্পূরক প্রশ্ন	:	Supplementary Question
জাতীয় সংসদ	:	The House of the Nation
বৈধতার প্রশ্ন	:	Point of Order
প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ	:	Notice of Motion

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

			পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	:	ভূমিকা	১-১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	সংসদীয় গণতন্ত্র: তাত্ত্বিক কাঠামো	১৩-৪৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমবিকাশ (১৮৬১-১৯৭২)	৪৯-৭৬
চতুর্থ অধ্যায়	:	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ: সরকার ও বিরোধী দলের দলগত অবস্থান এবং সম্পর্ক	৭৭-১০৪
পঞ্চম অধ্যায়	:	পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১-১৯৯৫: সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন এবং সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক	১০৫-১২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	সপ্তম জাতীয় সংসদ ১৯৯৬-২০০১: সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক	১২৬-১৫০
সপ্তম অধ্যায়	:	সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক: আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রায় এর প্রভাব	১৫১-১৭৭
অষ্টম অধ্যায়	:	গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ, উপসংহার ও সুপারিশ	১৭৮-১৯৩
সহায়ক গ্রন্থাবলা	:		১৯৪-২০৪
পরিশিষ্ট	:		২০৫-২০৯

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন বলে অভিহিত করা হয়। সে কারণেই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা (Parliamentary form of government) অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। এই ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে নিজেদের মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। ফলে বিশ্বের গণতন্ত্রকামী রাষ্ট্রগুলো জনগণের সর্বাধিক অধিকার নিশ্চিত করতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে চলেছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র সর্বজনীন শাসন কাঠামোর রূপ ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতে নব্বই দশকে The Commonwealth Parliamentary Association তাদের The Resurgence of Democracy গ্রন্থে উল্লেখ করেছে যে, "Parliamentary democracy has become the almost universal model of government".[১]

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে বিশেষ করে বৃটেন, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রভৃতি দেশের পার্লামেন্টের সরকার ও বিরোধী দল পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সমুন্নত রেখে কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধীতামূলক সম্পর্কের কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে জাতীয় জীবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতির কারণে দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে সংসদের কার্যকারিতা। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের গুরুত্ব অপরিসীম। সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে Earnest Barker বলেছেন, "...opposition cannot be utterly negative, entirely critical or totally obstructive since, in democracy, the function it performs is fundamaentally positive."[২]

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারি দলের পাশাপাশি শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রাধান্য স্বীকৃত এ সম্পর্কে Prof. Laski বলেন, "The life of a democratic state is built upon party system. To talk of parliamentary democracy without an opposition is unthinkable."[৩] সরকারকে বিরোধী দলের

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিতা ও সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার ফলে সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব এখানে সংরক্ষিত। গুরুত্বের দিক দিয়ে ব্রিটেনে মহামান্য রাণীর কাছে বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা সরকারি দলের মতই। বিরোধী দলকে সরকারের বিকল্প নির্দেশ করে বিরোধী দলীয় নেতা সম্পর্কে Robert Dahl-এর মন্তব্য হচ্ছে "Leader of the opposition is treated in effect as Her Majesty's alternative Prime Minister".[৪]

সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারের প্রেক্ষাপটে জাতীয় জীবনে ঐক্য ও সমৃদ্ধির অর্জনে বিরোধী দল সম্পর্কে ভারত সরকারের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার সংসদ সদস্য মোরারজি দেশাই এর (Morarji Desai) এক প্রবন্ধের উদ্বৃতি দিয়ে বলা যায়, "There can be no democratic government without an oppositon. The opposition in the legislatures has, therefore, as much imporatnce as the ruling party. It must be respected by the government, benches so that the opposition can function with self respect and a sense of responsibility and do its duty for enhancing and securing the unity, strength and prosperity of the nation."[৫]

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন খুব বেশি দিনের নয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নির্মিত মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমুন্নত রেখে এদেশে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতি এবং তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) মতাদর্শীদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংসদীয় রাজনীতিকে ব্যহত করে। এই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দলগুলি বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চরমপন্থা কার্যক্রম বেছে নেয়। এরূপ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সেনা শাসনের সূত্রপাত ঘটে। সামরিক শাসনামলে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদ কর্তৃক পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সংশোধিত সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর চূড়ান্ত বিশ্বাস ও আস্থা, সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযোজনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জিত আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিমূলে বিভক্তির সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

সেনা শাসনামলের সাংবিধানিক পরিবর্তন এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী ও রাজনৈতিক দল সংগঠনের মিলিত প্রয়াসে ১৯৯০ এর সফল গণআন্দোলন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অনন্য অবদান রাখে। গণআন্দোলনের মুখে তদানীন্তন সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকার ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে। এই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ঐ বছরই পঞ্চম জাতীয় সংসদে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজনীতিতে দলীয় মতাদর্শগত বিভাজনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সরকার ও বিরোধা দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর জনগণের জীবনমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সাংঘর্ষিক সম্পর্কের কার্যকারণ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তাত্ত্বিকভাবে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের ধরন, জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমবিকাশমান পর্যায় উল্লেখপূর্বক পঞ্চম থেকে সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃত চিত্র গবেষণালব্ধ ফলাফল এই থিসিসে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা সমস্যার বিবরণ

সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক নির্ভর করে সংসদীয় রীতি-নীতি এবং সংসদ পরিচালনায় কার্য উপদেষ্টা কমিটির কার্যক্রমের উপর। সংসদীয় কার্য উপদেষ্টা কমিটি সাধারণত সরকারি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সরকারি ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে কার্য উপদেষ্টা কমিটি সংসদের প্রশ্নের সময় নির্ধারণ, বিলের অগ্রাধিকার, সময় বর্ধিতকরণ এবং সংসদ অধিবেশনের সময় পুন:নির্ধারণ, বিভিন্ন বিলের উপর সময় নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করে থাকে।

সংসদের সাধারণ বিধিতে, আলোচনায় সরকার ও বিরোধী দল পারস্পরিক আদান-প্রদানে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিরোধী দল কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উপর সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সরকার সাদরে গ্রহণ করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বিরোধী দলের প্রস্তাবে পরিবর্তন ঘটে। সাধারণ বিধিতে সরকার ও বিরোধী দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে একটি জাতীয় ঐকমত্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্রিটেনে জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার পক্ষ বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করে এবং জাতীয় সংকটে একযোগে কাজ করে। বিরোধী দল জানে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনের অধিকার আছে। তাই এর সিদ্ধান্তগুলো মেনে নেয়। আবার ক্ষমতাসীন দল জানে যে, সংখ্যালঘু বিরোধী দলের সমালোচনা করার অধিকার আছে, তাই তাকে সমালোচনার সুযোগ দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার ও বিরোধী দলের এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীল সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিরোধী দলবিহীন গণতান্ত্রিক সরকার অকল্পনীয়। সেজন্য সরকারও বিরোধী দলকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে থাকে।

একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কার্যাবলীকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বিরোধী দল আবশ্যক। সংসদীয় গণতন্ত্রে তা থাকা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বরাবরই দায়িত্বশীল বিরোধী দলের অভাব অনুভূত হয়েছে। এখানে দায়িত্বশীল বলতে বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত থেকে মন্ত্রিপরিষদের জবাবদিহিতাকে আদায় করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। এদেশের বিরোধী দল সংসদের অভ্যন্তরে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের পরিবর্তে রাজপথে আন্দোলন, সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহ-অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সংসদে যদি বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ঘটে তাহলে প্রকৃতপক্ষেই সংসদের মর্যাদা হবে প্রশ্নবিদ্ধ। ১৯৯১-এর পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে ঐক্যমত্যের সৃষ্টি হয় তা এদেশের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

বৃটেনে সরকার বিরোধী দলকে যেভাবে মর্যাদা প্রদান করে থাকে, আমাদের দেশে সেভাবে বিরোধী দলকে গ্রহণ করা হয় না। অন্যদিকে বিরোধী দল বৃটেনে যেভাবে সরকারের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার মাধ্যমে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে, আমাদের দেশে বিরোধী দলের আচরণে তা অনুপস্থিত। এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে অবদান রাখা। এই প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত গবেষণার মূল প্রশ্ন হচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের স্বরূপ কী? বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হবে। এই মূল প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করতে হলে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্থাপন প্রয়োজন। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ–

১. সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের ধরণ কেমন হয়?
২. কেন বাংলাদেশে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক তৈরি হয়নি?
৩. সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর জনগণের জীবন-যাত্রায় সরকার ও বিরোধী দলের সাংঘর্ষিক সম্পর্কের প্রভাব কী রকম?

গবেষণার উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধান এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২. জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত কারণ বিশ্লেষণ করা।
৩. সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির জনগণ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ হচ্ছে সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করাও এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা কর্মটি মূলত একটি গুনগত গবেষণা। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণাটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস হতে তথ্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে গবেষণা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষকের প্রকাশিত বই, বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সংসদ বিতর্ক, জাতীয় সংসদের কার্যবাহ, গেজেট, জার্নাল, পত্র-পত্রিকায় ব্যবহৃত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত পেশাজীবী শ্রেণি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যেমন, রিক্সা চালক, বিভিন্ন যানবাহনের চালক, দিনমজুর, হকার, কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ তাদের মতামত সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্বাচিত প্রশ্নমালার আলোকে ১০০ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে মতামত জরিপ পরিচালনা করে প্রাথমিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি

গবেষণা কর্মটির পরিধি ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই সময়ের সংসদীয় সরকারসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৯১-১৯৯৫ ও ১৯৯৬-২০০১ এই সময়কালে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকার মধ্যে একটি আলোচনা এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া গবেষক কর্তৃক নিজস্ব অভিজ্ঞতা সংযোজনের লক্ষ্যে অষ্টম জাতীয় সংসদের (২০-২৩ তম) অধিবেশন সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের আলোকে সংসদ সদস্যদের আচরণগত বিশ্লেষণ পর্বটিও গবেষণা কর্মের পরিধিতে যুক্ত করা হয়েছে। একইসাথে গবেষণা পরিধির আওতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রসঙ্গটিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার অনুকল্প

(১) সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

(২) সংসদের অভ্যন্তরে সরকার ও বিরোধী দলের পরস্পরের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণের ব্যর্থতাই পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

(৩) সংসদের ভিতরে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক সংসদের বাইরে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির জনগণের জীবন-যাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার যৌক্তিকতা

(১) বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির পটভূমিতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনুধাবনে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

(২) জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সরকার ও বিরোধী দল দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে গবেষণালব্ধ ফল কাজে লাগাতে পারে।

(৩) রাজনীতি বিজ্ঞানের গবেষক, ছাত্র, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও রাজনীতি সচেতন নাগরিক এই গবেষণা কর্মের ফলাফল দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

পুস্তক পর্যালোচনা

এমাজউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র : প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা*; (১৯৯২) গ্রন্থটিতে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা এবং বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে কামাল আহমেদ তাঁর নিবন্ধে সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সার্বিক কার্যক্রমের উপর কোন তথ্য প্রদান করেননি।

Shamsul Huda Harun এর Parliamentary Behavior in a Multi-National State 1947-58 Bangladesh Experience (1984) গ্রন্থটিতে বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের সংসদীয় আচরণের প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটিতে মূলত পাকিস্তানী শাসনামলের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষক এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের আচরণ এবং সম্পর্ক, সংসদীয় বিতর্ক, প্রশ্নের সময় বণ্টন, মূলতবি প্রস্তাব, সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাপনা, বাজেট আলোচনা, স্পীকার ও হুইপের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে পাকিস্তানী শাসনামলে আইনসভার দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা এবং এক্ষেত্রে নজরদারির প্রকৃত তথ্যচিত্র ফুটে উঠেছে। গবেষক তৎকালীন পাকিস্তানের আইনসভার সঙ্গে আমলাতন্ত্রের সম্পর্কের দিকটি এবং আইনসভায় প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলির দলীয় মতাদর্শকেন্দ্রিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন।

হাসানুজ্জামান চৌধুরী এর *নব পেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*; (১৯৯২) গ্রন্থটিতে বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে গণআন্দোলনের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি অনুসন্ধান করা এবং সংসদীয় ব্যবস্থার ভিত্তি মূল মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক মূল্যবোধ বিশ্লেষিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংকটে সংসদীয় ব্যবস্থা বাতিলের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে সুদীর্ঘকালের সামরিক শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। গবেষক বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার চিত্র

তুলে ধরার পাশাপাশি সংসদীয় ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে সংসদীয় সার্বভৌমত্ব, জবাবদিহিতা, সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয়গুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে।

Nizam Ahamed এর *The Parliament of Bangladesh*; (2002) গ্রন্থটিতে নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে পুন:প্রর্বতিত সংসদীয় ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। পঞ্চম এবং সপ্তম সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রম এবং কমিটি ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। তাছাড়া গ্রন্থটিতে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিপত্তিসমূহের উপর আলোকপাত করেছেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির চিত্রপট বর্ণীত হয়েছে। নিজাম আহমেদ সংসদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা করলেও বিরোধী দলের অবস্থানের উপর তেমন কোন আলোচনা করেননি।

Nazma Chowdhury তাঁর *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature (1947-58)*; (1980) গবেষণা কর্মটিতে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উপনিবেশিক পর্যায়ের আইনসভার কার্যক্রমের উপর আলোচনা করেছেন গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের সংসদীয় কার্যক্রমের প্রকৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

Md. Abdul Wadud Bhuiyan তাঁর *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*; (1982) গবেষণা গ্রন্থটিতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টিতে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের ভূমিকা বিশেষ করে পাকিস্তান পর্বে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীর পেক্ষাপটে স্বাধীকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল কর্তৃক জনসম্পৃক্ত রাজনীতির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গবেষক পাকিস্তানি শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের শাসনামলের পর্যায়ক্রমিক শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উৎঘাটনের চেষ্টা করেছেন। গবেষণাটিতে পাকিস্তান পর্বে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ধারণা লাভ করা যায়।

Golam Hossain এর *General Ziaur Rahman and the BNP* (1988) গবেষণা গ্রন্থটিতে কিভাবে জেনারেল জিয়াউর রহমান বিএনপি গঠন করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। গ্রন্থটিতে রাজনীতিতে সৈনিকের ভূমিকা, সেনা ছাউনীতে পর-পর ঘটে যাওয়া অভ্যুত্থান দমন এবং সরকার পরিচালনায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর দিক নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপির ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সামরিক শাসনামলের সামরিক শাসকের সঙ্গে বেসামরিক জনপ্রতিনিধিত্বের সম্পর্কের একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্ণিত গ্রন্থ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্যায়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ও

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসনামলে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের দলগত অবস্থান এবং রাজনীতির ক্রমবিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে।

Al Masud Hasanuzzaman এর *Role of Opposition in Bangladesh Politics* (1998) গবেষণাকর্মটি প্রকৃত তথ্যের আলোকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং সময়োপোযোগী। গবেষণাকর্মটি সংসদকেন্দ্রিক কার্যক্রমকে ঘিরে আবর্তিত হলেও এর প্রধান বিষয় নির্মিত হয়েছে "বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা" এক্ষেত্রে গণতন্ত্রে বিরোধী দলের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর বিভিন্ন শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদের ভিতরে ও বাহিরে বিরোধী দল কি ভূমিকা পালন করেছে এক্ষেত্রে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে তাদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটিতে সংসদকেন্দ্রিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিরোধী দলের সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের একটি চিত্র ফুটে উঠে। বিশেষ করে ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। গবেষণা কর্মটিতে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের স্বরূপ বিশ্লেষণপূর্বক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অবস্থার প্রতিফলন পর্যাপ্ত নয়।

H. S. Fartyal তাঁর Role of the Opposition in the Indian Parliament (1971) গবেষণা গ্রন্থটিতে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল, বিরোধী দলের প্রকৃতি, জাতীয় নির্বাচন এবং বিরোধী দল, আইন সভার দলীয় সংগঠন, নব নির্বাচিত সংসদের সংসদীয় সভা এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের প্রকৃত তথ্যচিত্র খুজে পাওয়া যায়। গবেষণা কর্মটিতে সংসদে মুলতবি প্রস্তাবের সময় বণ্টন, সরকারি বিল এবং প্রস্তাবনার মনোভাব, বেসরকারি বিল এবং প্রস্তাবনা, সংসদীয় বিধির উন্নয়নকল্পে অবদানসমূহ, সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষক সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন নির্ণয় করেছেন। সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের ধরন বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে গবেষক সংসদ সদস্যদের আচরণ, এক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অবস্থান তুলে ধরেছেন। গন্থটিতে জাতীয় বিরোধী দল সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়।

A. K. M. Shamsul Haque এর "Parliamentary Democracy: A Theoretical Analysis"; (1997) প্রবন্ধে মূলত সংসদীয় গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষক সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধানের কর্ম পরিধি ও অবস্থানগত বিষয় তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রপ্রধানের উদাহরণ স্বরূপ ব্রিটেনের রানী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পদের কথা উল্লেখ করেছেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক সংসদ গঠন, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে যৌথভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত দলগুলোর সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ গঠন এবং সংসদের নিকট মন্ত্রী পরিষদের ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়িত্বশীলতার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্ণয় করা হয়েছে। অপরদিকে, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অবস্থান, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক সরকারি দলের প্রতি অনাস্থা গঠিত হলে বিরোধী দলের সরকার গঠন প্রক্রিয়া। সরকার ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা, পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সংহতি সৃষ্টি এবং সরকারি নীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ডের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস উল্লিখিত হয়েছে। গবেষণা কর্মে সংসদীয় গণতন্ত্রের গুরুত্ব, জনপ্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণ, বিরোধী দলের সহ-অবস্থান এবং গঠনমূলক সমালোচনা ও সংসদের স্থিতিশীলতার বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষক রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদের ভিতরে ও বাইরে দলীয় কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি এবং প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটিও পর্যালোচনা করেছেন।

Iftekharuzzaman & Mahbubur Rahman এর "Transition to Democracy in Bangladesh: Issues and Outlook" (1991) প্রবন্ধে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ক্রান্তিকাল পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটিতে ১৯৯০ এর গণআন্দোলন, সামরিক শাসনের অবসান, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণআন্দোলন কেন্দ্রিক ঐকমত গঠন, জাতীয় ঐকমতের মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন এবং পুন:প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। উল্লিখিত গবেষণায় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উপর আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিগত দুই দশকের অতীত অভিজ্ঞতা। গণতন্ত্রায়নের সমস্যা এবং বাংলাদেশের রাজনীতির প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়েছে। গবেষণায় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিষয়ের অবতারণা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ভিত্তি, গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের জননীতি প্রণয়নে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও গ্রুপভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামত প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

গবেষণা কর্মটিতে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কেন্দ্রিক জাতীয় ঐকমত্য এবং মৌলিক নীতিমালার বিষয়গুলি যেমন জনগণের সরকার, সাংবিধানিক উপায়ে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর, সরকারের অঙ্গসমূহের যথাযথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, সামাজিক সংগঠনের প্রভাবমূলক ভূমিকা, প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের সক্রিয়মূলক কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, কার্যকর আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা, প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। তাছাড়া, বিদ্যমান সামাজিক শ্রেণী সংগঠনসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষমতা, বিশেষ করে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় কতটুকু কার্যকর রয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদের শাসনামলেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণায় গণতন্ত্রায়নের জন্য জনগণের ক্ষমতায়ন, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব বজায় রাখা এবং নির্বাচনী রায়ের জয় পরাজয় মেনে নিয়ে পারস্পরিক আস্থামূলক পরিবেশ সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করার মত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণায় আত্মউন্নয়ন নির্ভরতার দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। এ সম্পর্কে সামাজিক সমতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ নির্দেশিত হয়েছে এবং দারিদ্র দূরীকরণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণায় শূন্যতা

উল্লেখিত পুস্তক এবং প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গবেষকগণ সংসদীয় কার্যক্রমের উপর তথ্য ও উপাত্তভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক পটভূমি এক্ষেত্রে পাকিস্তানী শাসনামলের সংসদীয় কার্যক্রম, সংসদের দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা, পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন, বাতিল, সামরিক শাসনে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি শাসন, সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন, সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর গবেষকগণ আলোকপাত করেছেন। গবেষণা কর্মগুলিতে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সহ-অবস্থান ও সম্পর্কের একটি ধারণা লাভ করা গেলেও জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরে সরকার ও বিরোধী দলের আন্ত:সম্পর্ক নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটেই বিদ্যমান গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে।

উপসংহার

উল্লিখিত অধ্যায়ে প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়বস্, 'সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক' বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গবেষণার মূল প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের স্বরূপ কী? এই মূল প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে কী ভূমিকা পালন করছে তা জানা। এই প্রেক্ষাপটে পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের পরিধির আওতায় সংসদের ভিতরে সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে।

অধ্যায় বিন্যাস

এই গবেষণা কর্মটির **প্রথম অধ্যায়ে** গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার পরিধি, সাহিত্য পর্যালোচনা, অনুকল্প এবং গবেষণার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের ধরন নির্ণয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্র, সংসদীয় শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা, সরকারি দল, বিরোধী দল, বিভিন্ন দল ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং এর ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে আইনসভার উন্মেষ, বঙ্গীয় আইন পরিষদ, পাকিস্তান পর্ব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকাল পর্যন্ত সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের দলগত অবস্থান ও ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনামলে জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের দলগত অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন, সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া, গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন, রাজনৈতিক দল গঠন এবং সাংবিধানিক সংশোধনীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম সংসদের সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে সংসদীয় কার্যক্রমের আলোকে সংসদ বিতর্ক কার্যক্রমে সময় বণ্টন, প্রশ্নোত্তর পর্ব, মুলতবি প্রস্তাব, অর্ধঘণ্টা আলোচনা, আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রম, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংসদীয় কার্যক্রমের ভিত্তিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণও এই অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সমাজের নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির জনগণ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে একটি গবেষণা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপে বেশ কিছু প্রশ্নমালার আলোকে নির্বাচিত ১০০ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাবলী গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য ও অনুমিত সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উপসংহার ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১। The Commonwealth Parliamentary Association, 1991-2001 (2001), *The Resurgence of Democracy*, London: The Commonwealth Parliamentary Association Secretariat, p. 42.

২। Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: The University Press Limited, p. 8.

৩। Agarwal, N. N. et.al. (1978), *Principles of Political Science*, New Delhi: Ram Chand & Co., p. 109.

৪। Potter, Allen (1967), Great Britain: Opposition with a Capital "O", Dahl, Robert A., ed., *Political Oppositions in Western Democracies*, New Haven: Yale University Press, p. 14.

৫। Moraji, Desai (1976), *Role of opposition in the parliament and the state legislatures*, S. L. Shakdher (ed.), (See the constitution and the parliament in India), New Delhi: National Publishing House, p. 550.

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাত্ত্বিক কাঠামো

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র একটি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক শাসন পদ্ধতি। সংসদের এই দায়িত্বশীলতার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষেই সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। এই অধ্যায়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক শীর্ষক গবেষণা কর্মটির প্রেক্ষাপটে বিষয়টি তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র, সংসদীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, দলীয় রাজনীতির বিকাশ, সরকারি দল, বিরোধী দল, বিভিন্ন দল ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক; সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার বিষয়টি এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র শব্দটি গ্রীক শব্দ Demos এবং Kratos থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Demos এর অর্থ জনগণ এবং Kratos এর অর্থ শাসন বা কর্তৃত্ব। অর্থাৎ গণতন্ত্রের বুৎপত্তিগত অর্থ হল জনগণের শাসন।[১] গ্রীক রাষ্ট্র দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল এবং থুসিডাইভস এর দর্শন চিন্তায়ও গণতন্ত্রে জন্য শাসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গণতন্ত্র সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গ বক্তৃতায় বলেন, "The government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth".[২] Shorter Oxford English Dictionary গণতন্ত্রের আভিধানিক অর্থে উল্লেখ করেছে যে, "Government by the people; a form of government in which the power resides in the people and is exercised by them either directly or by means of elected representatives; a form of society which favours equal rights, the ignoring of hereditary class distinctions, and tolerance of minority views.[৩] গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় Gettell এর অভিমত হচ্ছে "Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power.[৪] Hallowell বলেছেন "has termed democracy as the art of compromise".[৫]

আধুনিক শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে চলেছে এ সম্পর্কে Giddings বলেন, "A democracy may either be a form of government, a form of state, a form of society or a combination of all the three".[৬]

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে Carlton Clymer Rodee ও Carl Quembly Christal গণতন্ত্রকে এক ধরনের জনসম্পৃক্ত সরকার ব্যবস্থা বা শাসন পদ্ধতি এবং একটি জীবন পদ্ধতি (A way of life) বলে অভিহিত করেছেন।[৭]

আধুনিক যুগে আমরা যে গণতন্ত্রের অনুশীলন করে থাকি তার মূল উৎস প্রাচীন গ্রীসের গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা। গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম মৌল অবদান হচ্ছে মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার।[৮] প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য তার 'ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপিতে এবং বৈদেশিক পরিব্রাজক ও বিবরণী লেখকগণের বর্ণনা অনুযায়ী প্রাচীন ভারতে প্রজাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির অস্তিত্ব দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখা যায় যে, হিন্দুকুশ হইতে গোদাবরী নদীর উত্তর পর্যন্ত নানা শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার কতগুলি রাজতান্ত্রিক আবার কতগুলি প্রজাতান্ত্রিক। উত্তর বিহারের 'ভৃজ্জী-লিছভী' রাষ্ট্র গোষ্ঠী (Federation) ছিল প্রজাতান্ত্রিক।"

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচারী প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেই এই সমস্ত প্রজাতন্ত্রগুলির আবির্ভাব ঘটে। এদের প্রশাসন ও বিচার কার্যাদি গণবৈঠকে নিয়ন্ত্রিত হইত। এই গণবৈঠকগুলির নাম ছিল পরিষদ।[৯] অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের প্রণেতা কৌটিল্য তৎকালীন ভারতের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন যে, "আমাত্যবর্গ সম্রাটকে প্রশাসন সম্পর্কে সহায়তা করতেন এবং জরুরী অবস্থায় সম্রাট মন্ত্রী পরিষদ নামক একটি সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করতেন।[১০]

বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রভাব এবং এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, গ্রীসের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হতে বর্তমান কালের পরোক্ষ গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটেছিল ইংল্যান্ডের রাজা জন এর আমলে স্বাক্ষরিত ১২১৫ সালের মহাসনদ চুক্তির (Megna Carta) মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১২৯৫ সালের মডেল সংসদ, ১৬২৫-১৬৪৯ সালের পিটিশন অব রাইটস, ১৬৮৮ সালের মহান বিপ্লব (Glorious Revolution), এবং ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল (Bill of Rights) এর মাধ্যমে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১]

ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁ ও রিফরমেশন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উদারতাবাদী চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটে এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক জন লকের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কিত (Two Treatics on Civil Government 1690) গ্রন্থটি ইংল্যান্ডে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জন লকের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু রচনা করেন (The Spirit of Laws 1748)। এই গ্রন্থের মাধ্যমে আধুনিক সাংবিধানিক গণতন্ত্রের এক বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি রচিত হয়।

এই গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারানায় সমসাময়িক ফ্রান্সের রুশো, স্কটল্যান্ডের ডেভিড হিউম, জার্মানীর ইমানুয়েল কান্ট এবং আমেরিকার থমাস জেফারসন এবং বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গণতন্ত্র 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ' (Individualism), 'হিতবাদ' (Utilitarianism) ও 'উদারনৈতিকতাবাদ' (Liberalism) এর ধ্যান ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'উদারনৈতিক গণতন্ত্র' (Liberal Democracy) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্র দু'প্রকার যথা– প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) এবং পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)।

প্রাচীন গ্রীসে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রীক নগর রাষ্ট্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি সম্পর্কে Alan Renwick & Ian Swinburn এর Basic Political Concept গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "democracy was the form of government in which all qualified citizens were allowed and even required, to participate in the government of the city state."[১২] বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের এরূপ প্রচলনের অবসান ঘটলেও সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্যান্টনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়ার প্রচলন রয়েছে।[১৩]

অপরদিকে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা সরাসরি দেশের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ না করে তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন তখন তাকে পরোক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়। এ সম্পর্কে John Stuart Mill বলেন, "The whole people or some numerous portion of them exercise the governing power through deputies periodically elected by themselves."[১৪]

পরোক্ষ গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখে সকলের মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের অধিকার সম্পর্কে Robert Dahl বলেন, "The right to participate in governmental decisions by casting a vote."[১৫] মানব সমাজে মূলত অন্যায়, অসাম্য বঞ্চনাকে অতিক্রম করার জন্যই গণতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রে যদি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় তাহলে শোষণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে Gettell লিখেছেন যে, "Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power."[১৬] গণতন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে Cole এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, "I believe in democracy because I believe that every citizen has a right to play a part in deciding how society can best be organized in the cause of human happiness."[১৭]

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এজন্যই আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal democracy) বলা হয়। পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে, প্রতিনিধিত্ব ধারণা, সংখ্যাগরিষ্টের শাসন, বিরোধী দল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিকল্প সরকার ইত্যাদি বিষয়গুলি সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত। International Encyclopedia of Social Sciences-এ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Democracy as a system based on competitive parties, in which the governing majority respect the rights of minorities."[১৮]

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল অপরিহার্য। বিরোধী দলের অস্তিত্বকে মেনে না নিলে তা গণতান্ত্রিক শাসন হতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বার্নস বলেন, "Democracy as an ideal is a society of equals in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole".[১৯] গণতন্ত্রে অবাধ মত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত। জনগণ সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রদান করতে পারেন। মত প্রকাশে কেউ বাধা দিতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হল জনমত। জনমতের স্বার্থ সমুন্নত রাখার পাশাপাশি গণতন্ত্রে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে। ন্যায় বিচারের জন্য যেমন গণতান্ত্রিক শাসন আবশ্যক, গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। আইনের চোখে সবাই সমান। আইনগত ব্যাপারে নাগরিকদের মধ্যে কোন প্রকার বিমাতাসূলভ আচরণ করা যায় না।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ পূর্ণ মাত্রায় ঘটলেই শোষণ-বঞ্চনা প্রতিহত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের জন্য সাম্য (Equality) ও স্বাধীনতা (liberty) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনগণের সাম্য ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারলে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। আর সে কারণেই সাম্যভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জন অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিনির্মানে সাম্য ও স্বাধীনতা রক্ষার পাশাপাশি মানবাধিকার সংরক্ষণে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিশ্বজনীন মানবাধিকারের একটি সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে। মানবাধিকারের ৩০ দফা ঘোষণাপত্রে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্বলিত বিষয়গুলি স্থান পায়। ঘোষণাপত্রের ২১ দফার (ক)-তে বলা হয়েছে যে, "সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের নিজ দেশের সরকার গঠনে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।[২০] ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এবং ১৭৯৩ সালের ফরাসি ঘোষণায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলি স্থান পায়।[২১] আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবাধিকার রক্ষাও হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে Wolf বলেন, "A democratic society is a society of free, equal, active and intelligent citizens, each man choosing his own way of life for himself and willing that other should choose

theirs."[২২] প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। জনগণের অংশগ্রহণের নিমিত্তে সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়গুলি একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক সরকারকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। কারণ সংসদীয় সরকার তার কর্মকাণ্ডের জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি করে থাকে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে "International Encyclopedia of the Social Sciences এর volume II তে বলা হয়েছে, "Parliamentary Government or Cabinet Government is the form of constitutional democracy in which executive authority emerges from and is responsible to legislative authority". সংসদীয় গণতন্ত্রে দুই ধরনের শাসক প্রধান দেখা যায়। যথা নামমাত্র শাসক এবং প্রকৃত শাসক। প্রকৃত শাসক সরকার প্রধান, যেমন বৃটেন, ভারত এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। অপরদিকে নামমাত্র শাসক রাষ্ট্রপ্রধান নামে পরিচিত যেমন, বৃটেনের রাজা বা রানী কিংবা ভারত বা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সরকার গঠন করেন।[২৩] প্রধানমন্ত্রী তার পছন্দ মতো ব্যক্তিদের মন্ত্রীসভায় স্থান দেন। প্রধানমন্ত্রী ও তার মনোনীত মন্ত্রীসভা সংসদের কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকে। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভা যতক্ষণ সংসদের আস্থাভাজন থাকে ততক্ষণ সরকার টিকে থাকে। সুতরাং সরকার নির্বাচন ও সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সংসদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, শক্তিশালী কমিটি ব্যবস্থা, মনোযোগ আকর্ষণ, সংসদীয় বিতর্ক ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সংসদকে নির্বাহী বিভাগের তদারকির ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। কার্যকর তদারকির বিষয়টি উল্লেখ করে ভারতীয় সংসদ সম্পর্কে Kaul and Shakhder বলেছেন, "while parliament ... does not itself govern the country, it exercises elective supervision, in various ways, through use of parliamentary procedures and a system of committees."[২৪] সংসদের তদারকি সম্পর্কে Anthony H. Birch বলেছেন, "... the function of parliament is not to govern the country but to control the government."[২৫]

ক্যাবিনেট তার কর্মকাণ্ডের জন্য আইনসভার অনাস্থা ভোটে পদত্যাগ করতে পারে। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই সংসদ বিরোধী দলের মাধ্যমে বিকল্প সরকার বা ছায়া সরকার (shadow cabinet) নির্ধারণ করে থাকে। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, ... a principal task of parliament is to provide the personnel for government and through the opposition parties, personnel for alternative government."[২৬] সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের গুরুত্ব অপরিসীম। বিরোধী দলের ভূমিকা

তুলে ধরে Lowell বলেন, "Her Majesty's opposition in the U.K. is considered as the greatest contribution of British Parliamentary System to the art of government."[২৭] বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সংসদ কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থায় সংসদ একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব সম্পর্কে Carl J. Friedrich বলেন, "Parliament until recently have been the institutional core of modern representative government."[২৮] সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে না। অর্থাৎ শাসন বিভাগ আইনসভার অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্যাবিনেট ও আইনবিভাগ সম্পর্কে Bagehot বলেন, "hyphen that joins, the buckle that binds the executive and legislative departments together."[২৯] সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের কাজের অনুমোদন লাভ করতে হয়।

সংসদ কর্তৃক প্রাপ্ত অনুমোদনের মাধ্যমেই সরকারের জবাবদিহিতা কার্যকর হয়ে উঠে। সংসদ-কেন্দ্রিক কার্যক্রমকে জবাবদিহিমূলক করতে সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে অন্য কোনো বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ন্যায় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থাও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। রাষ্ট্রপতি একাধারে সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে Walter Bagehot বলেন, "The independence of the legislative and executive powers is the specific quality of presidential government just as fusion and combination is the principle of cabinet government."[৩০]

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রপতি শাসিত ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সংসদীয় চরিত্র প্রতিনিধিত্বমূলক হলেও প্রকৃত নির্বাহীর আইনসভার প্রতি দায়িত্বশীলতার কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের কাছে দায়ী থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সরকার প্রধান হিসেবে তিনি এবং তার মন্ত্রী পরিষদ কংগ্রেসের কাছে দায়ী নন। কিন্তু বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের সদস্যবর্গ শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্টের কাছে দায়ী। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্যাবিনেট সদস্যদের সম্পর্কে Garner-এর প্রকৃত বিশ্লেষণ হচ্ছে "What has been called 'presidential' government as contra-distinguished from cabinet or parliamentary government, is that system in which the executive (including both the head of the state and his ministers) is constitutionally independent of the legislature in

respect to the duration of his or their tenure and irresponsible to it for his or their political policies."[৩১]

রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় একজন রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। এই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হলে তাকে অপসারণ করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি অক্ষম, দুর্নীতিগ্রস্থ ও সংবিধান অবমাননাকারী হন তাহলে আইন বিভাগ তাকে অভিশংশনের মাধ্যমে অপসারণ করতে পারে। রাষ্ট্রপতি দলীয় প্রভাব মুক্ত হয়ে একক সিদ্ধান্তে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন। Herman Finer আমেরিকান প্রেসিডেন্সির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, "It is popularly elected, in practice directly" and "It is a 'solitary' not a 'collective' executive."[৩২] রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত থাকে। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকরী হওয়ার কারণে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদ সদস্যদের নিয়োগদান করেন এবং তারা যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির আস্থাভাজন থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতায় বহাল থাকেন। এই ব্যবস্থায় দলীয় প্রভাব কম থাকায় রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক কাজে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য থাকলে ও আইনসভায় বিরোধী দলের প্রাধান্য নেই। কারণ নির্বাহী বিভাগকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। কার্যকর সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক সমঝোতামূলক পর্যায়ে উপনীত হতে হয়। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা সংসদীয় প্রভাব মুক্ত হওয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠে না। সুতরাং বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের আইনসভায় বিরোধা দলের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। Robert A. Dahl আমেরিকান কংগ্রেসের বিরোধী দল সম্পর্কে বলেন, "Oppositions are not usually very distinctive; they are not even clearly identifiable as oppositions; they melt into the system."[৩৩]

দলীয় রাজনীতির বিকাশ

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি, তাত্ত্বিক কাঠমোর আলোকে বিশ্লেষণের এ পর্যায়ে দলীয় রাজনীতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রাসঙ্গিক। সঙ্গত কারণেই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা দলীয় রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত। সেকারণেই সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির ঐতিহাসিক পটভূমির চিত্র প্রতিফলিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাজনৈতিক দল জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ সাধন করে থাকে। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনমত গঠন ও প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্বার্থের সমষ্টিকরণের আধুনিক কাঠামো হলো রাজনৈতিক দল। রাজনেতিক দল সম্পর্কে A. C. Kapur এর Principle of Political Science গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Political parties are responsible for maintaining a continuous connection between the people and those who

represent them either in the government or in the opposition."[৩৪] রাজনৈতিক দল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুসংগঠিতভাবে কাজ করে থাকে। Carl Friedrich রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলেন, "a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, and with the further objective of giving to members of the party, through such control, ideal benefits and advantages."[৩৫] রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব সম্পর্কে MacIver বলেন, "there can be no unified statement of principle, no orderly evolution of policy, no regular resort to the constitutional device of parliamentary elections, nor of course any of the recognized institutions by means of which a party seeks to gain or to maintain power."[৩৬]

দলীয় রাজনীতির উন্মেষ ঘটে সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টির স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তাপ্রসূত কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। গ্রীক নগর রাষ্ট্র এথেন্স ও গ্রাকচাই এর রোমে প্রথম দলীয় ব্যবস্থা অঙ্কুরিত হয়।[৩৭] আধুনিক বিশ্বে উনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামোতে প্রথম রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটে এবং বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক দল বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য দেশসমূহে রাজনৈতিক দলের আধুনিক ধারণার সূত্রপাত ঘটে। দলীয় ধারণা প্রসূত বিষয়গুলি ছিল জনমত, জনপ্রিয় ক্লাব বা সংগঠন, দার্শনিকদের সংগঠন এবং সংসদীয় গ্রুপ। এই সময় সংগঠনকে প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনৈতিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে হয়নি। ব্রিটেনে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিভিন্ন সংসদীয় গোষ্ঠী ছিল। আইনসভার মধ্যেই এই সমস্ত গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকত। পরবর্তীকালে দল ব্যবস্থা সংসদের ভেতর থেকেই গড়ে উঠে এবং হুইগ ও টোরী দলের জন্ম হয়।[৩৯]

ব্লন্টসলি ১৮৭৫ সালে Theory of the State গ্রন্থে দলীয় সরকারের কোন আভাস না দিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটেনে মন্ত্রিপরিষদ ও গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিলে মন্ত্রিপরিষদ পদচ্যুত হতে বাধ্য হতো। এক্ষেত্রে ১৮৩৮ সালের পিল ক্যাবিনেটের পতন একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।[৪০] দলীয় রাজনীতি বিকাশের ক্রম বিবর্তনে ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কার আইনে সম্প্রসারিত ভোটাধিকারের মাধ্যমে দলীয় ব্যবস্থা প্রসারিত হয়। এই আইনের মাধ্যমে হুইগ ও টোরী দলের নাম পরিবর্তিত হয়ে উদারনৈতিক দল (Liberal Party) এবং রক্ষণশীল দল (Conservative Party) জন্ম লাভ করে। ঊনিশ শতকের শেষে শ্রমিক দল আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিক দলের সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্যে দিয়ে সংসদের নিম্নকক্ষের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়েই মূলত সংসদের রীতিসিদ্ধ সামাজিকীকরণ ঘটে।[৪১] ইংল্যান্ডে ফেবিয়ান সোসাইটি ও দার্শনিক সংঘের ভূমিকায় লেবার পার্টির জন্মসূত্রের ন্যায় ইউরোপের ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও উদারনৈতিক দল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পটভূমিই রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও বিকাশকে প্রভাবিত করেছে।

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে দলীয় রাজনীতির বিকাশ ঘটে উনিশ শতকে। ভারতে দলীয় রাজনীতি উন্মেষের পূর্বেই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক ঘটে। এরূপ ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন ও সংস্থার মধ্য দিয়ে। যেমন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬), বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫২), বোম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৪), মাদ্রাজ নেটিব অ্যাসোসিয়েশন, পুনা সার্বজনিন সভা এবং ১৮৬৫ সালে দাদাভাই নওরোজীর উদ্যোগে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪২] ১৮৬৭ সালে দুইজন আদি ব্রাহ্মণ রাজ নারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রবর্তন করেন হিন্দু মেলার। জাতীয়তা বোধের নব জাগরণের সুর ধ্বনিত হয় হিন্দু মেলায়।[৪৩] উল্লিখিত সামাজিক সংগঠনগুলো শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশাত্ববোধ ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচিত করে যার চূড়ান্ত ফলশ্রুতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগ ও ভূমিকা ছিল অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউমের। যিনি ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান। হিউম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথমে লর্ড রিপনের এবং পরে ডাফরিনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে হিউম বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলার অনেক রাজনৈতিক সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেন।[৪৪] ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর ডাফরিনের সম্মতি নিয়েই বোম্বের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের হল রুমে এবং বোম্বের বোর্ডিং হাউজে বর্তমানে মোম্বাই ব্রিটিশ ভারতের ২৫০টি জেলার মধ্যে ২৭টি জেলার ৭২ জন প্রতিনিধির যোগদানের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সূচিত হয়।[৪৫]

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতে দলীয় রাজনীতির উন্মেষ ঘটলেও কংগ্রেস ভারতের সকল জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২১ বৎসর পর ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪৬] ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগ জনস্বার্থ বিরোধী চরিত্র ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে. এম. দাস লেনের রোজ গার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে ২১-২৩ অক্টোবর তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলটি আওয়ামী লীগ নাম নিয়ে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করে।[৪৭] ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত এবং পাকিস্তান ডোমিনিয়নে ওয়েস্টমিনিস্টার পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ওয়েস্টমিনিস্টার পদ্ধতিতে 'সরকারি বিরোধী দল' থাকে। সংসদে 'সরকারি বিরোধী দল' ব্রিটেনের রাণীর অনুগত বিরোধী দলের (Her Majesty's Loyal Opposition)

ঐতিহ্যে গড়ে উঠেছে। সংসদে বিরোধী দল দায়িত্বশীলতা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিরোধী দলীয় নেতার মর্যাদা একজন কেবিনেট মন্ত্রীর সমতূল্য বলে গণ্য করা হয়। অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের এরূপ অবস্থা সুসংহত রয়েছে।[৪৮] ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় আওয়ামী লীগ বিরোধী দলীয় রাজনীতির উন্মেষ ঘটায় এবং কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৪৯] পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকায় সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন্দ্র ও প্রদেশে কার্যকর হতে পারেনি। কারণ পাকিস্তানে কোন সরকারই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহনশীলতা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করার পেছনে পাকিস্তান পর্বের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অনুপ্রাণিত করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে দায়িত্বশীল সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও সরকারি দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং বিরোধী দলের প্রাধান্য না থাকার কারণে সংসদ দায়িত্বশীলতার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। দলীয় রাজনীতির বিকাশের পটভূমিতে দেখা যায় যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এর কারণ হচ্ছে সরকারি দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সরকারের স্থায়ীত্বহীনতা, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, দলগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সামরিক হস্তক্ষেপ এবং শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতি।

সরকারি দল

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সরকার ও বিরোধী দল অপরিহার্য। সংসদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্নে সরকারি দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের নির্বাহীকে সংসদে জবাবদিহি করতে হয় এবং আস্থাভাজন থাকতে হয়। সংসদ এবং নির্বাহী বিভাগের এ মিশ রূপ বা Fusion সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৫০] সরকারি দল কর্তৃক প্রকৃত নির্বাহী ক্যাবিনেট এবং সংসদ পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে সংসদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সরকারি দল কর্তৃক নিয়োজিত স্পীকার। বৃটেনে স্পীকার পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করে সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন এবং বিরোধী সদস্যরা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এভাবে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এ ধরনের ঐতিহ্য এখনও গড়ে উঠেনি। জাতীয় সংসদের স্পীকার বরাবরই বিরোধী দল কর্তৃক সরকারি দলের লোক হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন এবং প্রকৃতপক্ষেই নিরপেক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। সংসদে স্পীকার যাতে নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য হন সেই জন্য Westminister Convention-এ বলা হয়েছে। "Not engage in partisan controversy inside or outside the chamber, even at general elections".[৫১] সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংসদের স্পীকারের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির আবশ্যকতা রয়েছে। সংসদ পরিচালনায় স্পীকার যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারি দলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সংসদীয় কার্যক্রমে, যথা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, তর্ক এবং বক্তব্যদান, মুলতবি প্রস্তাব, সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সংসদের বিরোধী দল যাতে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে সরকারি দলকে সচেতন থাকতে হয়। সরকারি দলের সচেতনতার মাধ্যমেই বিরোধী দলের অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী সংসদীয় দলসমূহের মধ্যকার আনুষ্ঠানিক সহনশীলতা। বস্তুত সংসদে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মুখাপেক্ষী। সংসদের দায়িত্ব পালনে তারা সমভাবে শ্রম দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে Herman Finer বলেন যে, "This non-statistical relationship must be heeded to obtain the maximum of avoidable coercion".[৫২]

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের এই ধারাকে সচল রাখতে সরকারি দল বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি দল বিরোধী দলকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়ে একযোগে কাজ করলে সংসদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। নির্বাচিত সাংসদগণ গণতন্ত্র চর্চা, মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভসহ জ্ঞান বিতরণ করতে পারেন। কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী সংসদীয় দলসমূহ ও সাংসদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব হ্রাস পায়। সংসদীয় সংশ্লিষ্ট কাঠামোর কার্যকরী ভূমিকার মধ্যে দিয়ে সংসদ অধিবেশনের এজেন্ডা নির্ধারণ, সংসদীয় সময় বণ্টন, বিল প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব নিরসন হতে পারে। এভাবে সরকারি ও বিরোধী দলের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ, ভূমিকা পালন, বিতর্ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়।[৫৩] সুতরাং, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য কাম্য হচ্ছে সরকারি দল কর্তৃক বিরোধী দলের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা। সরকারি দলকে বিরোধা দল কর্তৃক বিরোধীতা মেনে নেওয়ার মনোভাব ধারন করতে হবে। বিরোধী দলের বিরোধীতা অবশ্যই গঠনমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জনকল্যানের প্রশ্নে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দলীয় বিবেচনা ছেড়ে দিয়ে সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই সমঝোতা, সংহতি ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দিকে এগোতে হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনায় ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে, অধিজন এর মঙ্গলের প্রশ্নে যে কোন ব্যাপারে সমর্থন প্রদান এবং জনস্বার্থ বিরোধী, সংকীর্ণ বিবেচনার যে কোন বিষয়ে সমালোচনা, সমর্থন প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয়গুলিই হওয়া দরকার সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি।[৫৪] সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এইরূপ মানদণ্ড ভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি দলকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

বিরোধী দল

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া জবাবদিহিমূলক দায়িত্বশাল সংসদ বিনির্মানেও বিরোধী দল অপরিহার্য। সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত দুই ধরনের বিরোধী দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল বা বিরোধীতা শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'opposition' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ বাধা দেওয়া বা প্রতিরোধ করা।[৫৫] The Penguin Dictionary তে বিরোধী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে "opposition as loose association of individuals, or political group or party wishing to change the government and alter its policy decisions".[৫৬] বিরোধী দল সম্পর্কে Robert Dahl বলেছেন, "The privilege of an organized opposition to turn to the electorate for their mandate against the government in polls and in legislature has been one of the significant landmarks in the growth and development of democratic institutions".[৫৭] সাধারণভাবে বিরোধী দল বলতে আমরা বুঝি একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল, যারা ক্ষমতার বাইরে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে গঠনমূলক প্রতিবাদ করে থাকে। উত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারের বিকল্প হিসেবে স্বীকৃত। এ বিষয়ে A. D. Lindsay মন্তব্য হচ্ছে, "good representative system necessitates a strong opposition and that opposition should be a substitute for the government".[৫৮]

বিরোধী দল সরকার পক্ষের দূর্বলতা চিহ্নিত করে বিকল্প নির্দেশ করে। এর ফলে সরকারের পক্ষে একক ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠা সম্ভব হয় না। এ কারণেই Earnest Barker বিরোধী দলকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার safety valve বলেছেন। বিরোধী দল সরকারের বিরোধীতা করবে, তবে বিরোধী পক্ষকেও সংযত পরিশীলিত এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। Barker এর মতে, "opposition cannot be utterly negative, entirely critical or totally obstructive since, in democracy, the function it performs is fundamentally positive".[৫৯]

বিরোধী দলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে Angela Sutherland Burger এর অভিমত হচ্ছে, "The functions of opposition parties is government are well known: to offer an alternative government, to criticize the government and administration, to check or brake the use of governmental powers, to articulate and aggregate interests, to harness the interests of group loyalties to the nation".[৬০] বিরোধী দলের উৎপত্তি কোন পরিকল্পিত উদ্যোগের ফলে হয়নি। সংসদীয় রাজনীতির কালক্রমে বিরোধী দল দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এক সময়ে বিরোধী দল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করত। Tierney বলেছেন, "The duty of an opposition was to propose nothing to oppose everything and to turn out the government".[৬১] দীর্ঘদিনের সুশৃঙ্খল দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বিরোধী দল ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে।

সংসদীয় বিরোধী দলের ধারণার শুরু ১৬৮৮ সালে। পরবর্তীতে বিরোধী দল 'His Majesty's Loyal Opposition' এর রূপ পরিগ্রহ করে উনিশ শতকে।[৬২] ১৮৩২ সালের সংস্কার আইন (Reform Act 1832) এর পূর্বে কমন্স সভাই সরকারের সমালোচনার দায়িত্ব পালন করত। সংঘবদ্ধ দলীয় ব্যবস্থার আবির্ভাবের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যে দল যখন সরকার গঠন করত কমন্স সভায় সেই দলের

সদস্যরা সরকারকে সমর্থন করতে শুরু করে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন নয় এমন দল বা দলগুলি সরকারের সমালোচনা অব্যাহত রাখে। বর্তমানে বিরোধী দল সাংবিধানিকভাবে আইনসম্মত উপায়ে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বিরোধী দলের স্বীকৃতি সম্পর্কে ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইনে (Ministers of the Crown Act 1937) দেখা যায়, যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেতা সরকারি কোষাগার থেকে বেতনভুক্ত হন।[৬৩]

আধুনিক বিশ্বে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯০৫ সালে কানাডা, ১৯২০ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ১৯৪৬ সালে ইউনিয়ন অব দক্ষিণ আফ্রিকা সংসদের বিরোধী দলীয় নেতাকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে।[৬৪] সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল অপরিহার্য। একইভাবে সংসদের কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। সুতরাং, এক্ষেত্রে বিরোধী দলের গুরুত্ব অপরিহার্য। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার ফলে সংসদে সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব সংরক্ষিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন সরকারের কাজে কতটুকু পড়ছে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব বিরোধী দলের। এ সম্পর্কে Gagliemo Farrero বলেছেন, "... in democratic countries the opposition is a means of popular sovereignty as vital and important as the government and to suppress the opposition is to negate the sovereignty of the masses".[৬৫] বিরোধী দলের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ভারতীয় লোকসভার (Lok Shaba) সংসদ সদস্য Bal Raj Madhok এর অভিমত হচ্ছে, "The role of the opposition is not only to oppose and criticize the government and the ruling party for its lapses and acts of omission and commission but also to provide an alternative to the people which they may choose through the ballot box to run the government."[৬৬]

গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিরোধী দলের ভূমিকা কি হবে এ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পার্লামেন্ট বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ অভিমত রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পটভূমিতে Griffith & Ryle বলেছেন, "The duty of Her majesty's opposition is to oppose Her majesty's government".[৬৭] কিন্তু সরকারের বিরোধীতা করাই বিরোধী দলের একমাত্র কাজ নয়। বিরোধী দলের প্রাপ্ত দায়িত্বের একটি প্রধান দিক হলো গঠনমূলক ও বাস্তবতার নিরিখে আচরণ করা। বিরোধা দল সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে যদি গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত বক্তব্য না রাখে তাহলে তাদের জন্য তা আত্মঘাতী বলে বিবেচিত হতে পারে। বিরোধী দলের প্রতি জনগণ বা ভোটারদের অধিকার রয়েছে যে, তাদের সরকার বিরোধী বক্তব্য বাস্তবায়ন করার উপায় কি হবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়ার। যদি বিরোধী দল উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে না পারে তাহলে জনসমর্থন লাভ না করে বরং হারাতে পারে। এজন্যই সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের দায়িত্বশীল আচরণ করা আবশ্যকীয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। Sir Ivor Jennings বিরোধী দলের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "তাৎক্ষনিকভাবে বিরোধী দল সরকারের বিকল্প এবং গণঅসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দ হিসেবে কাজ করে থাকে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের ন্যায়ই গুরুত্ব বহন করে। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না। 'মহামান্য' রানীর কাছে বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা সরকারি দলের মতই।[৬৮] বিরোধী দলকে সরকারের বিকল্প নির্দেশ করে, বিরোধী দলীয় নেতা সম্পর্কে Robert Dahl এর বক্তব্য হচ্ছে, "Leader of the opposition is treated in effect as Her Majesty's alternative Prime Minister".[৬৯] ব্রিটেনের মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের অফিসিয়াল বিরোধী দল, বৃটিশ সংবিধানের প্রথার একটি অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে।[৭০]

বৃটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের ন্যায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান এখনো সুসংহত হয়নি। বিরোধী দলের সাংবিধানিক মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সরকারি দলের মনোভাব অত্যন্ত নেতিবাচক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সরকারি দলের এইরূপ মনোভাবের কারণে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি হয়নি। সরকারকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বশীল বিরোধী দল, সরকার পরিচালনায় সহায়তাকারী হিসেবে জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে পারে। আর এক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণকে অর্থপূর্ণ করতে সরকারের দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য।

বিভিন্ন দল ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক:

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, বিভিন্ন দল ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক কিরূপ পর্যায়ে রয়েছে, তার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ সংগত কারণেই করার দাবী রাখে। সেই প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আলোচিত হল।

একদলীয় ব্যবস্থা

কোন রাষ্ট্রে যখন একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাজমান থাকে তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। অধ্যাপক আলমন্ড একদলীয় ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- একদলীয় ব্যবস্থা এবং সর্বাত্বক একদলীয় ব্যবস্থা। একদলীয় ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, দলটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে না। কিন্তু সর্বাত্বক একদলীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল কিছুর উপর প্রবল নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করা হয়। হিটলার ও মুসোলিনার সময়ে জার্মানীতে নাজীবাদী ও ইটালিতে ফ্যাসীবাদী দল একদলীয় ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।[৭১] ১৯২৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তুরস্কে 'People's Republican Party' কর্তৃক একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল।[৭২]

একদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী মতবাদ কোন সময়ই মান্য করা হয় না। এই ব্যবস্থায় দল বিরোধী কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। দলীয় সিদ্ধান্ত চরম ও অভ্রান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। বিরোধী মতবাদকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ সম্পর্কে Maurice Duverger বলেন, "The composition of the opposition is a factor to contend with. In one-party system, since the opposition is not allowed to exist as a separate institutions, it may take the form of a dissident group with minority tendencies and criticise the Government of Party meetings with varying degrees of freedom".[৭৩] একদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী মতবাদ নিষিদ্ধ হলেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় সমকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সর্ব স্তরের সদস্য এবং নেতৃবর্গের মধ্যে। এক সময়ে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ নিজেদের কর্ম ও নীতি নির্ধারণের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীদের সমালোচনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিরোধীতা সর্ব সময়ের জন্য সম্ভব ছিল না। স্ট্যালিনের সময়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধীতার কোন অনুমোদন ছিল না। অনুরূপভাবে ১৯৩৪ সালে জার্মানীতে নাৎসী পার্টি ক্ষমতায় আসার পর কোন বিরোধী মতবাদকে অনুমোদন করেনি।[৭৪]

একদলীয় ব্যবস্থায় একটি মাত্র দল থাকায় বিরোধী মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা থাকে না। এই ব্যবস্থায় বিরোধী দলের বা মতের কোন প্রাধান্য নেই। একদলীয় ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে 'One state, one leader, and one party' রাজনীতিতে বিশ্বাসী। Lipson বলেন, "The classic vice of all dictatorial system is their basic assumtion of the superiority and infallibility of those in power".[৭৫]

সমাজতান্ত্রিক দল ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের শাসন বলে অভিহিত করলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লগ্নে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে অর্জন করার কথা বলা হয়। মার্কস রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণায় বলেন, পুজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অনুশীলন একটি প্রহসন ছাড়া আর কিছুই না। গণতন্ত্রে জনগণ বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র শ্রেণীহীন রাষ্ট্রে সম্ভব, শ্রেণীভিত্তিক কোন রাষ্ট্রে নয়। গণতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসের এইরূপ ধারণার পাশাপাশি তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পাশ কাটিয়ে কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।[৭৬]

Lenin পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র সম্পর্কে তার State and Revolution গ্রন্থে বলেন, "পুজিতান্ত্রিক সমাজে যখন তার বিকাশের অনুকূল অবস্থা বিরাজ করে তখন আমরা যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দেখতে পাই তার মধ্যে আমরা কম-বেশি পূর্ণ গণতন্ত্রই দেখতে পাই। কিন্তু এই গণতন্ত্র ধণতান্ত্রিক শোষণের সংকীর্ণ ফ্রেমওয়ার্কে বাধানো গণতন্ত্র। এটি হচ্ছে, সংখ্যালঘুর গণতন্ত্র, বিত্তশালীদের গণতন্ত্র।[৭৭] গণতন্ত্র সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের এমন নেতিবাচক ধারণার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের বিষয় তত্ত্বগতভাবে উপেক্ষিত। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকদের মতাদর্শে জনগণের সর্বাধিক অধিকার নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে মাও সে-তুঙ বলেছেন যে, চীনে যে বিপ্লব হবে তা হবে নয়া গণতান্ত্রিক বা

জনতান্ত্রিক বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের যে একনায়কত্ব কায়েম হবে তা হবে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। সামন্তবাদের অবশেষসমূহ, আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজি ও সকল সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করা এই বিপ্লবের লক্ষ্য, যে ব্যবস্থায় থাকবে সকল শ্রেণী ও স্তরের জনগণের জন্য গণতন্ত্র।[৭৮]

সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক দল বিপ্লববাদের বিরোধী। এই দল গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতি। বর্তমানে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক ভিত্তি হল গণতন্ত্র কেন্দ্রিক। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নীতি আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও বর্তমানে পার্টির নীতিতে পরিবর্তন এসেছে। পার্টি এখন স্বাধীনভাবে চলার নীতি অনুসরণ করছে। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকার করে নিয়েছে।

একদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পতিষ্ঠার কোন সুযোগও নেই। সাম্প্রতিক বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দলগুলো গণতন্ত্রায়নের পক্ষে সাফাই গাইলেও প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার সঙ্গে এই সমস্ত দলগুলোর কোন আদর্শিক মিল নেই।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাঃ

সুনির্দিষ্টভাবেই প্রতিযোগিতামূলক দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে বৃটেনের Anglo Sexon যুগের চিন্তা প্রসূত ধারণা থেকে।[৭৯] দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে সেই ধরনের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাকে বুঝায়, যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানত: দুইটি দল প্রতিযোগিতা করে। যারা সাধারণত দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে উদার ও সমজাতীয়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে Robert Dahl বলেন, "The highest degree of concentration of opposition exists in two-party system, where the out-party has a substantial monopoly of the opposition".[৮০] প্রতিযোগিতামূলক দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিদ্যমান রয়েছে। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিযোগিতার ভাব বিদ্যমান। ফলে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীর স্বার্থ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে উপস্থিত হয়। এই ব্যবস্থা সমঝোতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপকে বাধা দেয় না।[৮১]

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ দলীয় ঐক্যের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে Rober Dahl এর Patterns of Opposition নিবন্ধে ব্রিটেন সম্পর্কে বলা হয়েছে। "Two-party systems with a high degree of internal party unity, as in Britain" এবং যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বলা হয়েছে "Two-party systems with relatively low internal party unity, as in the United States".[৮২]

দলীয় ব্যবস্থায় দল ব্যবস্থার মধ্যে সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হলে বিকল্প সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে Laski বলেন, "It is the only method by which the people can at the electoral period directly choose its government. It enables the government to drive its policy to the statute book. It makes known and intelligible the results of its failure. It brings an alternative government into immediate being".[৮৩] দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থান সুসংহত রয়েছে বিধায় সরকার ও গঠনমূলক সমালোচনাকে গ্রহণ করে তা সমাধানের উপায় খুজে বের করতে সচেষ্ট হয়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের এইরূপ অবস্থান তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সমঝোতা ও সহযোগিতামূলক পর্যায়ে উপনীত করে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অবস্থানের একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে।

বহু-দলীয় ব্যবস্থাঃ

যেখানে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল বিভিন্নমুখী স্বার্থ ও দাবী দাওয়াসমূহের সমষ্টিকরণ কার্যে নিয়োজিত রয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই সমস্ত দলের অন্তর্ভুক্তিকেই বহুদলীয় ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বহু-দলীয় ব্যবস্থা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথাঃ কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা ও অ-গতিশীল বহুদলীয় ব্যবস্থা। কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা নরওয়ে, সুইডেন, বেলজিয়াম ও স্ক্যান্ডিনেভীয়ান দেশসমূহে প্রচলিত রয়েছে। এই সমস্ত দেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি সমজাতীয় ও সনাতনী উপাদানে পুষ্ট বলে রাজনৈতিক দলের মধ্যে যথেষ্ট সমঝোতা বিদ্যমান। এই কারণে এই সমস্ত দেশগুলোতে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও বিরোধী কোয়ালিশন গড়ে উঠতে দেখা যায়। অ-গতিশীল বহু দলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও কৃষ্টি সমজাতীয় নয়। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সমঝোতা ও সহনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে স্বার্থ সমষ্টিকরণ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। ফ্রান্স ও ইটালিতে এই ধরনের দল ব্যবস্থা বজায় রয়েছে।[৮৪]

বহু-দলীয় ব্যবস্থায় কোন দলই সাধারণভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয় না। এর ফলে দলীয় কার্যক্রমে পরিবর্তন ঘটে তা নয়; বরং সরকারের সামগ্রিক কলা-কৌশলেও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন দলের দর কষাকষি ও মতৈক্যের মাধ্যমে সরকারের সমন্বয় সাধিত হয়। এ ধরনের সরকার কোন দলের সরকার নয়; বরং কতগুলি দলের সমবায়ে গঠিত সরকার।[৮৫] বহু-দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে সরকার গঠনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা বিরাজমান থাকায় এককভাবে কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠে না। এ সম্পর্কে A. C. Kapur এর মন্তব্য হচ্ছে, "This is no common party leader who can bind them together into a team to play the game of politics under his captaincy".[৮৬]

বহুদলীয় ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব না থাকায় শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থান গড়ে উঠে না। দলগুলোর মধ্যে নীতি ও আদর্শগত পার্থক্য থাকার কারণে জোটবদ্ধভাবে সরকার বিরোধী অবস্থানের সৃষ্টি হয় না। এর ফলে বিকল্প সরকার গঠনের অস্তিত লক্ষ্য করা যায় না। এ সম্পর্কে H. S. Fartyal বলেন, The role of the opposition in such circumstances is different. It does not talk and act as an alternative government because of its heterogeneous composition.[৮৭] বহু-দলীয় ব্যবস্থায় ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সাময়িক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলেও উভয় দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হয় না।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক:

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। সংসদীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি সাধারণত সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল অর্থাৎ সরকার ও বিরোধী দলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক নির্ভর করে সংসদীয় রীতি নীতি এবং সংসদ পরিচালনায় কার্য উপদেষ্টা কমিটির কার্যক্রমের উপর।

উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে সরকার ও বিরোধী দলের সাংবিধানিক সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে H. S. Fartyal বলেন, "In a democratic country the majority and the minority party or parties together constitute the parliament. Though both the government and the opposition generally function as contending blocs, yet there is a tacit agreement that the majority is to govern and the minority is to criticise. Under the parliamentary practice, the majority concedes to the minority reasonable liberty of speech, expression, association and movement, and the minority, likewise, allows the majority to implement its programme. This is the natural and constitutional relation between the two sides.[৮৮]

বর্তমান কালে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক অনেকটাই নির্ভর করে সংসদীয় কার্য উপদেষ্টা কমিটি (Business Advisory Committee) মেনে চলার উপরে। সংসদীয় কার্য উপদেষ্টা কমিটি সাধারণত সরকারি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কার্য উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলা যায় যে, "Normally its reports were unanimously adopted by the House, but whenever the opposition was not satisfied with some of the reports controversial matters were discussed in the House".[৮৯] সরকারি ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে কার্য উপদেষ্টা কমিটি সংসদের প্রশ্নের সময় নির্ধারণ, বিলের অগ্রাধিকার, সময় বর্ধিতকরণ এবং সংসদ অধিবেশনের সময় পুন:নির্ধারণ, বিভিন্ন বিলের উপর সময় নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করে থাকে।

সংসদের সাধারণ বিধিতে, আলোচনায় সরকার ও বিরোধী দল পারস্পরিক আদান-প্রদানে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিরোধী দল কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উপর সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সরকার সাদরে গ্রহণ করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বিরোধী দলের প্রস্তাবে পরিবর্তন ঘটে। সাধারণ বিধিতে সরকার ও বিরোধী দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের রীতি সম্পর্কে বলা যায়, "In England the two chief whips of the government and the opposition constitute 'usual channels' to decide such matters".[৯০]

ভারতীয় সংসদেও বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সরকার আলোচনার সম্মতি দিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, "on 13th August 1954, for instance, the opposition demanded time for the discussion on events in foreign countries, Goa, French Possession in India, blood havoc in Bihar, West Bengal Assam and Uttar Pradesh. The Prime Minister accepted these demand".[৯১]

সংসদে সরকারি দল কর্তৃক উত্থাপিত বিলের আইনি পদক্ষেপের বিরোধীতা করা এবং বিকল্প প্রস্তাব পেশ করাই সাধারণত বিরোধী দলের কাজ। সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের এরূপ প্রভাব সম্পর্কে সরকারের সচেতন থাকাটা প্রয়োজনীয়। সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা সফল হতে পারে। ব্রিটেনের ক্যাবিনেট সরকারের উপর বিরোধী দলের প্রভাব সম্পর্কে Walter Bagehot বলেন, "Her Majesty's opposition; that it was the first government which made a criticism of administration as much a part of the policy as administration itself. This critical opposition is the consequence of cabinet government".[৯২]

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের পেছনে সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ককে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে, ১৯৫২ সালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সংসদ অধিবেশন বক্তৃতায় বলেন, "We would welcome – cooperation from every member of this House, whether he sits on this side of the House or on opposite".[৯৩]

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনঅধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "In this process the representative system plays a vital role. It is largely through this system that public demands are expressed, modified, and presented to the government".[৯৪] প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে উল্লিখিত উক্তিটি বাস্তবায়নে সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সঙ্গে সরকারি দলের ও

ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলীয় সদস্যদের জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে সচেষ্ট হতে হয়। এ সম্পর্কে John Stuart Mill বলেন, "Should a member of the legislature be bound by the instructions of his constituents? Should he be the organ of their sentiments, or of his own? their ambassador to a congress, or their professional agent, empowered not only to act for them, but to judge for them what ought to be done?"[৯৫]

সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যবর্গকে অবশ্যই জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করা উচিৎ। জনগণ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনের পূর্বশত হচ্ছে, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর বিশেষ করে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ককে কার্যকর করা। উভয় দলের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পেছনে বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সরকারি দলকেও এগিয়ে আসতে হবে। বিরোধী দল সংসদে সরকারের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। দায়িত্বশীল নির্বাহী গঠনে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে অস্ট্রিয়ার সংসদীয় গণতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে Frederick C. Engelmann বলেছেন যে, "The establishment of the first Republic in 1918 brought representative government with a responsible executive to Austria. Only from this point on did Austria have true parliamentary opposition – an opposition legitimately capable of replacing the government".[৯৬]

সংসদীয় গণতন্ত্রকে জনবান্ধব ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে উন্নত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশসমূহ সংসদীয় কার্য-প্রণালী ও রীতি-নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই সমস্ত দেশসমূহ সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির যথাযথ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে, ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে ওয়েস্টমিনিস্টার পদ্ধতির সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলন শুরু হলেও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে তা প্রতিষ্ঠিত রূপ লাভ করেনি। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক বিশেষিত তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে গঠিত হয়নি। বাংলাদেশের সরকার ও বিরোধী দল প্রতিনিয়ত জনস্বার্থকে ভুলে গিয়ে দলীয় সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত থেকেছে। এর ফলে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক বিরোধিতামূলক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। নীচে আমরা বাংলাদেশে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্কের বাস্তব অবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবো।

বাংলাদেশের বাস্তবতা

সহযোগিতামূলক এবং সংঘর্ষমূলক

জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক বিশ্লেষণে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর আচরণ বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এই সমস্ত দলগুলোর আচরণগত মনোভাব খুব কমই সহযোগিতামূলক অধিকাংশ

ক্ষেত্রে সংঘর্ষমূলক। নিজস্ব দলীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে দলগুলোর আচরণগত সম্পর্ক আবার সহযোগিতামূলক ও সংঘর্ষমূলক হয়ে থাকে। দলীয় অবস্থানের কারণে দলগুলোর মধ্যে কেবলই বিরোধিতামূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। উন্নত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশসমূহে যথা- বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এরূপ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সহনশীলতা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে থাকে। বস্তুত, সংসদে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মুখাপেক্ষী। সংসদের দায়িত্ব পালনে তারা সমভাবে শ্রম দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে Herman Finer বলেন যে, "This non-statistical relationship must be headed to obtain the maximum of avoidable coercion. The knowledge that someday the other side may be in office is a powerful support to such tolerance"।[৯৭] সংসদে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সরকার ও বিরোধী দল। সংসদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতাকে সমুন্নত রাখতে ইংল্যান্ডে উইনস্টন চার্চিল এবং এন্থনী ইডেন ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ১৯৭৪ সালে এডওয়ার্ড হীথ ও অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। একইভাবে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা মার্গারেট থ্যাচারও ক্ষমতা ও নির্বাচন থেকে সরে দাড়ান। বৃটেনের এনিরুন বিভান শ্রমিকদের কাছে প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ করতে না পেরে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন। ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বংশীলাল রেল দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।[৯৮] এভাবে সংসদ নেতা ও ক্যাবিনেট সদস্যদের দায়িত্বশীলতার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ১৯৭২ সালে প্রথম গণপরিষদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বিরোধী দলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "সুরঞ্জিতকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, কেননা প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য বিরোধী দল অপরিহার্য"।[৯৯] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে সংসদে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের একটি চিত্র ফুটে উঠে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সরকারের সাংগঠনিক কাঠামো ব্রিটিশ মডেলের অনুসরণে গঠিত হয়। যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব, কেবিনেট, সংসদে যৌথ দায়িত্বশীলতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদে আস্থাভাজন হওয়া এবং সংসদে সরকারিভাবে স্বীকৃত বিরোধী দলের উপস্থিতি। ১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদে ট্রেজারি বেঞ্চের ব্যাপক প্রাধান্য এবং বিরোধী দলের খুবই কম আসন প্রাপ্তির ফলে সংসদে 'সরকারি বিরোধী দল' (official opposition) বলে কিছুই ছিল না। তবে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সাংসদ আতাউর রহমান খান অল্প সংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্যকে সাথে নিয়ে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। তারা প্রশ্নোত্তর পর্বসহ বাজেট অধিবেশনে সমালোচনাধর্মী বক্তব্য, প্রশ্ন এবং সম্পূরক প্রশ্ন রাখেন।[১০০] প্রথম সংসদে বিরোধী দলের সীমিত আকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের সূচনা ঘটলেও সরকার ও বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য দিক লক্ষ্য করা যায় না।

সরকার ও বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, ১৯৯১ সালে গঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ। এই সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন ঘটে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে জাতীয় ঐকমত্য গঠিত হয়েছিল সেটি বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের প্লেনারি সেশনে বিরোধী দলের অসহযোগিতামূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করা গেলেও সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক সরব উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় ছিল।[১০১]

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক প্রবলভাবে সংঘর্ষমূলক হয়ে উঠে। সরকার ও বিরোধী দলের এই দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের পেছনে কারণ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে দু'টি পক্ষের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ। সংসদে পারস্পরিক অসহযোগিতার কারণে সংসদ থেকে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউট বয়কট পর্যন্ত গড়ায়। পঞ্চম সংসদের বিরোধী দল সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। অবশ্য অনাস্থা প্রস্তাবটি যথারীতি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়।[১০২]

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে বিরোধী দলের লাগাতার সংসদে বয়কট-এর কারণ ছিল মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি। বিরোধী দলের দাবী ছিল ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।[১০৩] এই দাবীর প্রেক্ষাপটে বিরোধী দল কর্তৃক লাগাতার হরতাল ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন এবং বিরোধী দলের সকল সাংসদের ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগের মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক সংঘর্ষমূলক পর্যায়ে উপনীত হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিল, ইমডেমনিটি পাবলিক সেফটি বিল, অর্ডিন্যান্স (রিপিল) বিল, স্থানীয় সরকার বিল, কমিটি ব্যবস্থা বিল ইত্যাদি বিলে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সীমিত বা শূন্য ছিল। বিরোধী দলের অভিযোগ হচ্ছে এই সমস্ত বিল পাসে সরকার তরিঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিল পাসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি। বিল পাসের ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে কোন সমঝোতা লক্ষ্য করা যায়নি। এর ফলে প্লেনারি সেশনে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউট বা বয়কটের ঘটনা ঘটে। বিরোধী দলের সংসদ বর্জনকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সাংঘর্ষিক সম্পর্ক তৈরি হয়। পরিশেষে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের সংসদীয় কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, সংসদ অধিবেশনে একই সাথে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক ছিল সহযোগিতামূলক, সংঘর্ষমূলক।

বিরোধিতামূলক

সংসদীয় রীতি-নীতিতে বিরোধী দলের গঠনমূলক বিরোধীতা সংসদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতাকে কার্যকরী করে তোলে। এখানে গঠনমূলক বিরোধিতা বলতে সংসদের ভেতরে বিরোধী দলের সংসদীয় বিতর্ক এবং বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, অনাস্থা প্রস্তাব, সংসদীয় কমিটি ইত্যাদি কার্যক্রমের বিধি সম্মত বিরোধিতামূলক অংশগ্রহণকে বুঝানো হয়েছে। বৃটেনের বিরোধী দলের আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Her Majesty's opposition is thus an essential part of the British government and its purpose is to criticize and scrutinize and not to hinder or obstruct the governmental business"।[১০৪] সরকার ও বিরোধী দলের দ্বন্দ্ব নিরসনে সংসদীয় কাঠামোর ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে সংসদ অধিবেশনের এজেন্ডা নির্ধারণ, সংসদীয় সময় বণ্টন, বিল প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত সংসদীয় প্রক্রিয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের আনষ্ঠানিক অংশগ্রহণ, ভূমিকা পালন, বিতর্ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে।[১০৫] জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে সংসদীয় কাঠামোতে সরকার ও বিরোধী দলের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণের প্রবণতা কম। যার ফলশ্রুতিতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকাংশে বিরোধিতামূলক। উভয় দলের এই বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে দলগুলোর দলীয় মতাদর্শের প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া দলগুলোর দলীয় কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি এবং সহনশীল মনোভাবের অভাব রয়েছে। সরকারের ভাল কাজের প্রশংসা এবং মন্দ কাজের বিরোধিতা করা বিরোধী দলের কাজ। বিরোধী দল জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতা করেছে। বিরোধী দলের এরূপ বিরোধিতায় 'সব কিছুতেই বিরোধিতাকে' প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিরোধী দলের চর্চায় কেবলই বিরোধীতামূলক আচরণ সংসদায় গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। বিরোধী দল সংসদীয় কার্যক্রমে শুধু সরকারি দলের বিপক্ষে গঠনমূলক বিরোধিতাই করে না। বিরোধী দল রাজনীতির মান উন্নয়নে, গুনগত নেতৃত্বকে সৃষ্টি করে থাকে। এ সম্পর্কে Nizam Ahamed এর Parliament of Bangladesh গ্রন্থে বলা হয়েছে, "The quality of performance and leadership which the opposition provides has a major bearing on the quality of politics as a whole".[১০৬]

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ না থাকায় এবং সরকারি দলের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিরোধিতাপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে যা, সংসদের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। এক্ষেত্রে সংসদের কোরাম সংকট, সংসদ নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর ব্যাপক হারে অনুপস্থিতির বিষয়টিও সম্পৃক্ত। নিম্নে জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের নির্ধারকসমূহ তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

স্পীকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা

সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে স্পীকারের নিরপেক্ষ অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। স্পীকারের অবস্থানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে "The Speaker is one of the great offices of the state. He is the chief officer of the parliament.[১০৭] এ সম্পর্কে Morris-Jones আরও বলেছেন যে, স্পীকার হলেন Member of Parliament No. 1.[১০৮] বিরোধী দলের অভিমত হচ্ছে, স্পীকার তার প্রাপ্য ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। স্পীকারের নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "To accomplish all his duties and responsibilities the quality which is the most essential for the speaker is 'strict impartiality'.[১০৯]

সংসদে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে স্পীকার তার স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে Sir Ivor Jennings বলেছেন, "Inside the House his word is law".[১১০] অবশ্য নিরপেক্ষতার প্রশ্নে স্পীকার সরকার ও বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক মনোভাব দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকে। স্পীকার নিয়োগের ক্ষেত্রে বৃটেনের পার্লামেন্টে সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সর্বদলীয় সমর্থনের ঐতিহ্য গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৪ নং অনুচ্ছেদ এবং জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৪ বিধিতে স্পীকারের ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১১] পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের স্পীকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্পীকার নিজেই কার্যপ্রণালী বিধি মেনে চলার ব্যাপারে সচেতন হননি।

১৯৯১ সালের ১৬ জুন পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সদস্যরা স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস-এর বিরুদ্ধে বিধি ভঙ্গের অভিযোগ এনে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন।[১১২] এ ধরনের ওয়াক আউটের দৃষ্টান্ত সপ্তম জাতীয় সংসদেও প্রত্যক্ষ করা যায়। অষ্টম জাতীয় সংসদের স্পীকারের বিরুদ্ধেও সঠিকভাবে কার্যপ্রণালী বিধি না মানার অভিযোগ রয়েছে। অষ্টম সংসদের ২১তম অধিবেশনের সমাপনী দিবসে সংসদ নেতা বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতা রাখেন। বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তৃতার পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্পীকারের সমাপনী বক্তৃতায় অধিবেশনের সমাপ্তি হবার কথা। কিন্তু স্পীকার প্রচলিত এই নিয়মটি উপেক্ষা করে শেখ হাসিনার বক্তৃতার পর সরকার দলীয় সদস্যদের বক্তৃতার সুযোগ দিলে বিরোধী দলীয় সদস্যরা স্পীকারের বিরুদ্ধে কার্য-প্রণালী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ আনেন এবং সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। সংসদে সময় বণ্টনের ক্ষেত্রেও স্পীকারের পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে। সরকার দলীয় সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগে বিরোধী দলের কুৎসা রটনায় অধিক সময় পান। তাদের মাইক বন্ধ করা হয় না। এক্ষেত্রে বিরোধী দলীয় সদস্যরা বৈপরীত্যের শিকার। প্রশ্ন উত্থাপনের সময়সীমা পার হওয়া মাত্র তাদের মাইক বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া স্পীকারের ব্যক্তিগত আচরণ এবং নানাবিধ মন্তব্য থেকেও পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দৃশ্যমান বিষয় হচ্ছে যে, স্পীকার কর্তৃক ফ্লোর প্রদানের সময় স্পীকারের ভাষাগত তারতম্যের মধ্যে দিয়ে

আচরণগত পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। উপরোক্ত ঘটনাবলী নি:সন্দেহে স্পীকারের নিরপেক্ষ অবস্থানকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে।

সরকার ও বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে সংসদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় স্পীকার নিরপেক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে পঞ্চম জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী সরকার ও বিরোধী দলের দূরত্ব কমিয়ে আনতে ১৯৯৪-১৯৯৫ সময়কালে ধারাবাহিকভাবে মত বিনিময় সভার উদ্যোগ গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে সপ্তম জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতামূলক ৪ দফা চুক্তির সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন।[১১৩]

সরকার ও বিরোধী দলের দ্বন্দ্ব নিরসন কল্পে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের স্পীকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সফলতা লাভ করেনি। কারণ বিরোধী দলের অভিযোগ ছিল স্পীকার উভয় সংসদে নিরপেক্ষভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারেনি। জাতীয় সংসদে স্পীকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা না থাকায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক উপেক্ষিত হয়ে বিরোধিতামূলক সম্পর্ক তরান্বিত হয়েছে।

সরকার ও বিরোধী দলের মনোভাব

সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর ও সফল করতে হলে সরকার ও বিরোধী দলের ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা উচিৎ। নেতিবাচক মনোভাবের কারণে পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল প্রকৃতপক্ষেই বিরোধিতাপূর্ণ। সংসদীয় সংস্কৃতিতে ইতিবাচক মনোভাবের বিষয়টি পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও রীতিনীতির প্রতীক। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে যথা ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডায় এ ধরনের সংসদীয় রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সাংবিধানিক স্বীকৃতির নিশ্চয়তা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশে এখনও এই সংস্কৃতির চর্চা সুরক্ষিত হয়নি।

জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব না থাকায় তাদের মধ্যে সহনশীল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় সংসদে সরকারি দল বিরোধী দলকে কখনও আস্থায় নিতে পারেনি এবং বিরোধী দলও সরকারের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করেনি। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব বিনির্মাণে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংসদ নেতা শুধু সরকারি দলের নেতা নয়। সংসদ নেতা বিরোধী দলের আইনগত অধিকার সংরক্ষণের অভিভাবকও বটে।[১১৪] সংসদ নেতার গুণগত পরিচয় সম্পর্কে Herbert Morrison বলেছেন, "The leader of the House ... should possess an intuitive instinct about what is going on in the minds of members of both side, and in case of any trouble brewing, he should be able to assess the

nature and extent of the commotion. When there is a strong parliamentary pressure on any matter, especially when it comes from both sides, he must be ready to bend to it".[১১৫]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের প্রতি সংসদ নেতার সহনশীলতামূলক মনোভাবের অভাব রয়েছে। অনুরূপভাবে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক সম্পর্কের পেছনে বিরোধী দলীয় নেতাও কর্তব্য পরায়ন নন। বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The LoO must criticize the incumbent government but he will also recognize the rights of government to govern. 'If the leader of the opposition lets the Prime Minister govern, he in turn is permitted to oppose'".[১১৬]

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার আচরণে উল্লিখিত স্বীয় অধিকার ও কর্তব্যের প্রতিফল দেখা যায় না। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা এবং বিরোধী দলীয় নেতা স্ব স্ব দায়িত্ব পালনকালে একে অপরের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। উভয় নেতার এরূপ মনোভাব দলীয় সদস্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে। পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিতর্ক কার্যক্রম চলাকালে নৌ-পরিবহন মন্ত্রী এম কে আনোয়ার বিরোধী দলীয় সদস্যদের আচরণকে 'গুণ্ডামী' বলে অভিহিত করেন। তার এই মন্তব্যের কারণে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। এরপর মন্ত্রী তার বক্তব্য প্রত্যাহার করলে সংসদের পরিবেশ স্বাভাবিক হয়।[১১৭]

১৯৯৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ফিলিস্তিনের হেবরণ মসজিদে ইহুদীরা আক্রমন করলে মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দল বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তাব করলে সরকারি দলও এতে সম্মতি প্রকাশ করে। তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা সংসদে অপ্রত্যাশিতভাবে উক্ত বিষয়টি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "I am enjoying their (the opposition members) speech, they are shedding crocodiles tears, and suddenly they have become Muslim".[১১৮]

বিরোধী দলের প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকার কারণে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী এরূপ মন্তব্য করতে পারেন। সপ্তম জাতীয় সংসদের বিতর্ক কার্যক্রমেও অসম্মানজনক আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই সপ্তম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সরকার সমর্থিত এমপি আ স ম আব্দুর রব বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেন। এই ঘটনার জন্য বিরোধী দল সংসদ সদস্যকে ক্ষমা চাইতে বলেন।[১১৯] সপ্তম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া ৫ আগস্টের অধিবেশনে বক্তৃতাকালে অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করে সরকার দলীয় সদস্যদেরকে 'বেয়াদব' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১২০]

পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের উল্লিখিত বিতর্ক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ পরস্পর আক্রমণাত্বক ও অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করে নেতিবাচক মনোভাবের

পরিচয় দিয়েছেন। উভয় দলের এরূপ নেতিবাচক মনোভাবের কারণে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সহযোগিতামূলক না হয়ে বিরোধিতামূলক পর্যায়ে পৌছেছে।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্কের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। সংসদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখা অপরিহার্য। সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধির আওতায় আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, সংসদীয় বিতর্কসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের ভিত্তি হওয়া উচিৎ জনকল্যাণকর। সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তটি অবশ্যই নির্মোহ ও জনবান্ধব হবে বলে জনগণ বিশ্বাস করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে দলীয় আজ্ঞাবহে পরিণত করেছে।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে"।[১২১]

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের সদস্যগণ দলীয় মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগত মতামত প্রদান করতে সক্ষম হয়নি। এই প্রক্রিয়ার কারণে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী উপেক্ষিত হয়েছে। ৭০ অনুচ্ছেদের মানদণ্ড সংসদ সদস্যদের এতটাই দলীয় আনুগত্যে সামিল করেছে যে, সাংসদগণ দলীয় মতাদর্শের বাইরে কোন কিছুই আমলে নিতে রাজি হয়নি। সাংসদগণ দলীয় আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে একে অপরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। সাংসদগণ প্রতিনিয়ত পরস্পরের প্রতি নেতিবাচক মন্তব্য করে নিজেদের আন্ত:সম্পর্ককে বিরোধপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সহযোগিতামূলক পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি।

কার্যপ্রণালী বিধি

কার্যপ্রণালী বিধি হচ্ছে সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পালনীয় বিধানাবলি। "বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদ পরিচালনার জন্য বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৭৫(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি নিয়ন্ত্রিত হইবে।

কার্যপ্রণালী বিধির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সংসদে বিরোধী দলের সদস্যগণ সরকারি দলের দমন থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে Hatsel বলেছেন, ... the only weapons by which the minority can defend themselves against ..., those in power are the forms and rules of forceedings".[১২২]

সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদ সদস্যদের বিশেষাধিকার সংক্রান্ত কিছু বিধি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন কোনো সংসদ সদস্যের বিশেষাধিকার ক্ষুণ্ন হলে তিনি তা সংসদে উত্থাপন করতে পারবেন (বিধি ১৬৩)।[১২৩] সংসদীয় কার্যক্রম যথা, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, সংসদীয় তদারকিমূলক ও আর্থিক কার্যক্রমসহ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে তা বাস্তবায়িত হয় না। কার্যপ্রণালী বিধিতে কিছু বৈষম্য রয়েছে। যেমন, ৭২(১) বিধি অনুযায়ী বেসরকারি সদস্যদের বিল উত্থাপনের জন্য ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হয়। অথচ ৭৫(১) বিধিতে মন্ত্রী বিল উত্থাপনের জন্য ৭ দিনের লিখিত নোটিশ দেবেন বলে বলা হয়েছে। এই সমস্ত বিধিসমূহ বেসরকারি সদস্য ও মন্ত্রীদের সংসদে বিল উত্থাপনের সুযোগ সমভাবে প্রদান করেনি। কার্যপ্রণালী বিধির ৭৪(২) ও ৭৪(৩) বিধিতে বলা হয়েছে, বেসরকারি সদস্যদের বিল উত্থাপনে স্পীকার ভোটের আয়োজন করতে পারেন। বিলটি ভোটে দিলে বিরোধী দলীয় বেসরকারি সদস্য নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হবেন।

কার্যপণালী বিধির উল্লিখিত বিধিতে বৈষম্য থাকায় বিষয়টি সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এছাড়া স্পীকার এবং সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সংসদীয় কার্যক্রমে বিধি বহির্ভূত পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করেছেন। কার্যপ্রণালী বিধিতে বৈষম্য থাকায় এবং বিধির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধিতামূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের আলোকে সহযোগিতাপূর্ণ নয়, বরং বিরোধিতাপূর্ণ। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হবার সময়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে জাতীয় ঐকমত্য গঠিত হয়েছিল তা পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়নি। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সরকার ও বিরোধী দলের আন্তঃসম্পর্ক কখনও সহযোগিতামূলক কখনও সংঘর্ষমূলক। তবে অধিকাংশ সময় জুড়েই এই সম্পর্ক বিরোধিতামূলক পর্যায়ে উপনীত ছিল।

উপসংহার

জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতাকে সমুন্নত রাখে। যা অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করা যায় না। সে কারণেই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের গুরুত্ব অপরিসীম। সংসদীয় গণতন্ত্রে সাংবিধানিকভাবে বিরোধী দল স্বীকৃত হলেও একদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের শক্তিশালী অবস্থান সুসংহত হলেও বহুদলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ীত্বের কারণে বিরোধী দলের অবস্থান দূর্বল হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদবর্গ সংসদের নিকট জবাবদিহি করে না বলে বিরোধী দলের গুরুত্বের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কেবলমাত্র সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায়ই বিরোধী দল সরকারি দলের পাশাপাশি অবস্থান করে সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে।

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে সংসদের কার্যকারিতা। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বিশেষ করে বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত প্রভৃতি দেশে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সাংবিধানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এই স্বীকৃত সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিরোধী দলের গুরুত্ব বিবেচনা করে বৃটেনে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলকে বলা হয় "His or Hery majestys government, His or Her majestys opposition". বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এ ধরনের সংসদীয় রীতি-নীতির প্রচলন হয়নি। জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের আন্ত:সম্পর্কের বাস্তব অবস্থার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের আইনগত অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের কারণে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক ও বিরোধিতামূলক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দলগুলোর দাবী ছিল যে, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়, সময় বণ্টনে, মূলতবী প্রস্তাব অনুমোদনে, বিলের সংশোধনী গ্রহণে তাদের অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। এছাড়া স্পীকারের নিরপেক্ষতা, সরকার ও বিরোধী দলের মনোভাব, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ এবং সংসদীয় কার্য-প্রণালী বিধিসমূহের মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের অধিকার সংরক্ষিত না হওয়ার বিষয়টি সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় সংসদ অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Kapur, A. C. (2002), *Principles of Political Science*, New Delhi: S Chand & Company Ltd., p. 377.

২। Hossain, Mohammad Sohrab, *Role of Opposition in Democratic Politics: A Study with Special Reference to Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2006), Ph.D. Thesis*, Dhaka University, p. 28.

৩। *Shorter Oxford English Dictionary* (2002), New York, Oxford University Press, p. 637.

৪। Gettell, Raymond Garfield (1950), *Political Science*, Calcutta: The World Press Ltd., p. 199.

৫। Hossain, Mohammad Sohrab, *op.cit.*, p. 28.

৬। Gidding, F. J. (1963), *Responsible State*, New Delhi: South Asia Pulisherd, p. 22.

৭। Rodee, C. C. (1973), ed., *Introduction to Political Science*, New York: McGrow Hill Book Company, p. 93.

৮। রহমান, মোঃ মকসুদুর (১৯৯১), *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, রাজশাহীঃ ইমপিরিয়াল বুক্স, পৃ. ৭৬।

৯। ভট্টাচার্য, নির্মল চন্দ্র (১৯৭৫), *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, কলিকাতাঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ২-৩।

১০। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩-৪।

১১। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স* ১৯৯১-২০০৭, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ২-৩।

১২। Renwick, Alan & Swinburn, Ian (1983), *Basic Political Concepts*, London: Hutchinson & Co. Ltd., p. 124.

১৩। রহমান, মোঃ মকসুদুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

১৪। Kapur, A. C., *op.cit.*, p. 383.

১৫। Dahl, Robert A. (1967), ed., *Political Opposition in Western Democracies*, New Haven: Yale University Press, p. xi.

১৬। Gettell, Raymond Garfield, *op.cit.*, p. 199.

১৭। Sharan, P. (1965), *Political Organization and Comparative Government*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd., p. 39.

১৮। Sills, David L. ed., *International Encyclopedia of Social Science*, New York: The MacMillan Company & The Free Press, vol. 3, p. 112.

১৯। রহমান, মোঃ মকসুদুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

২০। Raphael, D. D. (1967), 'Human Rights, Old and New', Raphael, D. D., ed., *Political Theory and the Rights of Man*, London: MacMillan, pp. 54-59.

২১। *Ibid*, pp. 61-62.

২২। রহমান, মোঃ মকসুদুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

২৩। Kapur, A. C., *op.cit.*, p. 382.

২৪। Kaul, M. N. and Shakhder, S. L. (1997), *Practice and Procedure of Parliament*, 4th edition, New Delhi: Lock Sabha Secretariat, p. 11.

২৫। Anthony, H. Birch (1998), *The British System of Government*, London: Routledge, p. 163.

২৬। ফিরোজ, জালাল (২০০৩), *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ২৭।

২৭। Agarwal, N. N. et.al., (1978), *Principles of Political Science*, New Delhi: Ram Chand & Co., p. 109.

২৮। John, Ayto (1992), *Dictionary of Word Origins*, Delhi, p. 348.

২৯। Kapur, A. C. (1975), *Principles of Political Science*, New Delhi: S. Chand & Co. Pvt. Ltd., p. 439.

৩০। *Ibid*, p. 450.

৩১। Garner, J. W. (1951), *Political Science and Government*, Calcutta: The World Press Pvt. Ltd., pp. 311-312.

৩২। Finer, H. (1977), *The Theory and Practice of Modern Government*, Delhi: Surjeet Publications, p. 667.

৩৩। Dahl, Robert A., 'The American Oppositions: Affirmation and Denial', Dahl, Robert A., ed., *op.cit.*, p. 34.

৩৪। Kapur, A. C., *op.cit.*, p. 638.

৩৫। *Ibid*, p. 639.

৩৬। *Ibid*, p. 640.

৩৭। আহমদ, এমাজউদ্দিন, (অনুদিত), (১৯৯৬), *আধুনিক রাষ্ট্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৯০।

৩৮। Duverger, Maurice (1978), *Political Parties their Organization and Activity in the Modern State*, London: University Press Cambridge, p. xxiii.

৩৯। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।

৪০। আহমদ, এমাজউদ্দিন (অনুদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০।

৪১। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।

৪২। রশিদ, হারুন-অর (২০১৩), *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ৪৮।

৪৩। উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৭), *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ৫০।

৪৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬২।

৪৫। Mehra, Ajay K. (2006), 'Historical Development of the Party System in India', Mehra, Ajay K., ed., *Political Parties and Party Systems*, New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd., p. 50.

৪৬। রশিদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

৪৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

৪৮। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮।

৪৯। রশিদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।

৫০। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

৫১। Rahman, Md. Nojibur (2000), *The Independence of the Speaker: The Westminister Model and the Australia Experience*, Dhaka: Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, p. 22.

৫২। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

৫৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

৫৪। হাসান উজ্জামান, আল মাসুদ (১৯৯২), *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকা: অক্ষর, পৃ. ৪২-৪৩।

৫৫। Fartyal, H. S. (1971), *Role of the Opposition in the Indian Parliament*, Allahabad: Chaitanya Publishing House, p. 1.

৫৬। *Dictionary of Politics* (1986), London: Penguin Books, p. 243.

৫৭। Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: UPL, p. 5.

৫৮। *Ibid*, p. 7.

৫৯। *Ibid*, p. 8.

৬০। Burger, Angela Sutherland (1969), *Opposition in a Dominant-Party System*, Los Angeles: University of California Press, p. 19.

৬১। Jennings, Sir Ivor (1961), *Parliament*, London: Cambridge University Press, p. 167.

৬২। Fartyal, H. S., *op.cit.*, p. 1.

৬৩। Dahl, Robert A. ed., *op.cit.*, p. 4.

৬৪। Fartyal, H. S., *op.cit.*, p. 2.

৬৫। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 7.

৬৬। Madhok, Bal Raj (1976), 'Opposition in the Parliament and the State Legislatures', Shakdher, S. L. ed., *The Constitution and the Parliament in India*, New Delhi: National Publishing House, p. 550.

৬৭। Griffith and Ryle (1989), *Parliament: Functions, Practice and Procedures*, London: Sweet and Maxwell, p. 338.

৬৮। আহমেদ, কামাল উদ্দিন (১৯৯৫), 'সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা', জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ, সম্পাদিত, *গণতন্ত্র*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৮৯।

৬৯। Potter, Allen, 'Great Britain: Opposition with a Capital "O"', Dhal, Robert A., ed., *op.cit.*, p. 14.

৭০। *Ibid*, p. 13.

৭১। রহমান, মো: মকসুদুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯-২৯০।

৭২। Duverger, Maurice (1978), *Political Parties their Organization and Activity in the Modern State*, London: Methuen & Co. Ltd., p. 276.

৭৩। Fartyal, H. S., *op.cit.*, p. 2.

৭৪। *Ibid*, p. 2.

৭৫। রহমান, মোঃ মকসুদুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

৭৬। উদ্দিন, মুহাম্মদ আয়েশ (১৯৯০), *রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি*, রাজশাহীঃ মৌসুমী পাবলিকেশন্স, পৃ. ২১৬।

৭৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯-২৫০।

৭৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬।

৭৯। Duverger, Maurice, *op.cit.*, p. 208.

৮০। Dahl, Robert A., 'Patterns of Opposition', Dahl, Robert A., ed., *op.cit.*, p. 333.

৮১। আহমদ এমাজউদ্দিন (২০০৩), *তুলনামূলক রাজনীতিঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, পৃ. ১৩৯।

৮২। Dahl, Robert A., 'Patterns of Opposition', Dahl, Robert A., ed., *op.cit.*, p. 335.

৮৩। Kapur, A. C., *op.cit.*, p. 659.

৮৪। কাসেম, মোহাম্মদ আবুল (১৯৯০), *তুলনামূলক রাজনীতি*, রাজশাহীঃ ডায়মন্ড কর্ণার, পৃ. ১৩১-১৩২।

৮৫। আহমদ, এমাজউদ্দিন (অনুদিত) (১৯৯৬), *আধুনিক রাষ্ট্র*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩০৪।

৮৬। Kapur, A. C., *op.cit.*, p. 657.

৮৭। Fartyal, H. S., *op.cit.*, p. 3.

৮৮। *Ibid*, p. 204.

৮৯। *Ibid*, p. 204.

৯০। *Ibid*, p. 205.

৯১। *Ibid*, p. 206.

৯২। Dhal, Robert A., *op.cit.*, p. 6.

৯৩। Fartyal, H. S., *op.cit.*, p. 211.

৯৪। Birch, A. H. (1966), *Representative and Responsible Government: An Essay on the British Constitution*, London: George Allen and Unwin Ltd., p. 21.

৯৫। Mill, John Stuart (1971), *Utilitarianism Liberty Representative Government*, London: Aldine Press, Letchworth: Herts for J. M. Dent & Sons Ltd., p. 315.

৯৬। Engelmann, C. Frederick, 'Austria: The Pooling of Opposition', Dhal, Robert A., ed., *op.cit.*, p. 261.

৯৭। Finer, Herman, op.cit., pp. 378-383.

৯৮। হাসানউজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

৯৯। দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল ১৯৭২।

১০০। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

১০১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

১০২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

১০৩। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 19.

১০৪। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

১০৫। Ahmed, Nizam, *op.cit.*, p. 192.

১০৬। Majumder, Shantanu and Choudhury, Zahid ul Arefin (2001), "Working of the Parliament of Bangladesh", *Bangladesh Political Science Review*, Department of Political Science, University of Dhaka, vol. 1, no. 1, June, p. 161.

১০৭। Harun, Shamsul Huda (1984), *Parliamentary Behaviour in a Multi-National State 1947-56: Bangladesh Experience*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, p. 14.

১০৮। Firoj, Jalal (2012), *Democracy in Bangladesh Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Dhaka: Bangla Academy Press.

১০৯। Jennings, Ivor (1968), *The British Constitution*, Fifth Edition, London: ELBS, p. 94.

১১০। ফিরোজ, জালাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৭।

১১১। Firoj, Jalal, *op.cit.*, p. 188.

১১২। *Ibid*, pp. 190-191.

১১৩। *Ibid*, p. 193.

১১৪। *Ibid*, p. 193.

১১৫। *Ibid*, p. 194.

১১৬। *Ibid*, p. 199.

১১৭। *Ibid*, p. 201.

১১৮। *Ibid*, p. 203.

১১৯। *Ibid*, p. 203.

১২০। *দৈনিক সংবাদ*, ৪ অক্টোবর ২০০১।

১২১। Grifith, J. A. G. and Ryle, Michael, *op.cit.*, p. 172.

১২২। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, ধারা-১৬৩।

১২৩। ফিরোজ, জালাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমবিকাশ (১৮৬১-১৯৭২)

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ঐতিহাসিক পটভূমি গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপ-মহাদেশে বৃটিশ শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্মেষ এবং সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমবিকাশ ও এরই সূত্র ধরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্যায়ে এ বিষয়ের পর্যালোচনা এই অধ্যায়ে আলোচিত হলো।

১৭৫৭ সাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের অধীনে যাওয়ার একশত বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ (প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাঙালি সৈনিক কর্তৃক এই বিদ্রোহ ঘটেছিল। সমকালীন ইতিহাসবিদগণ, ইউরোপীয় সিভিলিয়ান, রাষ্ট্রনায়ক এবং লেখকগণ সিপাহী বিদ্রোহের কারণ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে Thomas Metcalf এর মতামত হচ্ছে, "Something more than a Sepoy Mutiny, but something less than a national revolt".[১] সিপাহী বিদ্রোহের কারণ যাই হোক না কেন, এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ১৮৫৮ সালে এক ঘোষণা বলে ভারতবর্ষে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেন। ভারতে বৃটিশ সরকারের সরাসরি শাসন জারি হওয়ার পর বৃটেনের অনুকরণে আইনসভার উদ্ভব ঘটে। ভারতীয় আইনসভা ক্রমান্বয়ে, ধাপে ধাপে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। বৃটিশ সরকারের শাসনভার গ্রহণের বহু পূর্বে ১৭৭২ সালের 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' এবং ১৭৮৪ সালের 'পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট'কে এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর দ্বারা ভারতের জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল ও তার একটি নির্বাহী পরিষদ (Executive Council)-এর ব্যবস্থা করা হয়।[২] বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এই আইনটি ছিল ভারতে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইন ছিল ভারতে আইনসভা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। এই আইনের মাধ্যমে গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের বিস্তৃতি ঘটানো হয় এবং অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে বৃদ্ধি করে ১২ করা হয় যার অর্ধেক ছিলেন বেসরকারি সদস্য। এই আইনের বিধান বলে বাংলার জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হয়। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ছিলেন এর সভাপতি। ১২ জন মনোনীত সদস্য ছিলেন। এদের মধ্যে ৪ জন বেসরকারি বাঙালি সদস্য। বাঙালি সদস্যবৃন্দ ছিলেন:

নবাব আব্দুল লতিফ, রাজা রামপ্রসাদ রায় (রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ ছেলে), রাজা প্রতাপচন্দ্র (বর্ধমানের জমিদার) এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর (দ্বারকানাথ ঠাকুরের চাচাতো ভাই)।[৩]

১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নির্বাহী পরিষদ এবং আইনসভার উভয় ক্ষেত্রে সরকারি সদস্যদের প্রাধান্য ছিল। বৃটিশ সরকারের অনুগত ভারতীয়দের বেসরকারী সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হত। এই আইনে গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের কারণে আইনসভাগুলো নির্বাহী পরিষদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটিতে পরিণত হয়। প্রথম বঙ্গীয় আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পারিক তাত্ত্বিক সম্পর্কের কোনো কার্যকারিতা ছিল না। কারণ আইনসভার প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত ছিলেন না। তারা ছিলেন গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত। ১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইনে আইনসভার প্রকৃত চিত্রের পতিফলন না ঘটলেও এই আইনের মাধ্যমেই ভারতীয়রা আইন প্রণয়ন কাজে সংশ্লিষ্ট হয়। মূলত এই আইনের দ্বারাই ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল আইনসভার ভিত্তি রচিত হয়।

১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস হওয়ার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের আইন পরিষদসমূহের বিস্তৃতি ঘটিয়ে সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। এই আইনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন এবং সংসদে প্রশ্ন করার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় নূন্যতম ১০ জন এবং সর্বাধিক ১৬ জন অতিরিক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যা পূর্বের ১৩ জনের স্থলে ২১ জনে (সভাপতিসহ) উন্নীত করা হয়। এদের মধ্যে মনোনীত সদস্য সংখ্যা ছিল ১০। তারা কলকাতা কর্পোরেশন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপালিটি, জেলা বোর্ড এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক মনোনীত/নির্বাচিত হবেন মিউনিসিপালিটিসমূহ ৬, জেলা বোর্ডসমূহ ১, অন্যান্য তিনটি সংস্থার প্রত্যেকে ১ জন করে মোট ৩ জন। নতুন আইন অনুযায়ী ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয় আইনসভা গঠিত হয়। এ আইনসভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মৌলবী সিরাজুল ইসলাম, মৌলবী আব্দুল জব্বার, আনন্দ মোহন বসু, নাটোরের জগদীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ।[৪]

১৮৯২ সালের আইনে আইনসভার পরিধি, ক্ষমতা ও কার্যাবলী পূর্ববর্তা আইনের তুলনায় বৃদ্ধি করা হলেও তা ছিল সীমিত আকারের। এই আইনে সদস্যগণ প্রশাসনিক বিষয়সহ বাজেট নিয়ে প্রশ্ন করতে পারতেন তবে তাদের কোনো ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। এ ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, "There still remained an official majority on the councils and there was still no approach to a parliamentary system".[৫]

ভারতীয় আইনসভার ক্রমবিবর্তনে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এই আইনে গভর্ণর জেনারেল এবং তার নির্বাহী কাউন্সিলরসহ ৬০ জন অতিরিক্ত সদস্য রাখা হয় যার মধ্যে ২৭ জন ছিলেন বেসরকারি এবং

নির্বাচিত। আইনসভাসমূহে সরকারি সদস্যদের স্থলে বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হয়। আইনসভার সাধারণ বেসরকারি সদস্যগণের নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আইনসভার সদস্যরা বাজেট বা অর্থ বিল নিয়ে আলোচনা করার অধিকার লাভ করে। এছাড়া একমাত্র বৈদেশিক সম্পর্ক ও দেশীয় রাজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত জনস্বার্থ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে তারা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারতেন। এই আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়।

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনে বাংলার আইনসভার গঠন-কাঠামোও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। ১৭ জন সরকারি এবং ৩১ জন বেসরকারি সদস্য নিয়ে নতুন এ আইনসভা গঠিত হয়। সরকারি সদস্যরা পূর্বের ন্যায় মনোনীত এবং বেসরকারি সাধারণ সদস্যরা বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও স্বার্থগোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচিত ছিলেন।[৬] ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনে নির্বাহী পরিষদ ও আইনসভায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এ আইনে প্রাদেশিক আইনসভায় বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং সংসদে বাজেট আলোচনাসহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার সম্বলিত বিষয়াবলী ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় জনসম্পৃক্ততার অংশীদারত্বকে নিশ্চিত করে। এই আইনের মধ্যে দিয়ে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পারিক সহ অবস্থানের একটি প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পাশ করে। এই আইনে কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রতিষ্ঠা করা হয়। উচ্চ কক্ষের নাম Council of State বা রাজ্য সভা এবং নিম্নকক্ষের নাম Legislative Assembly বা ব্যবস্থাপক সভা। উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০। এর মধ্যে ৩৪ জন হবেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্টরা সরকার কর্তৃক মনোনীত। নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৫। তম্মধ্যে ১০৫ জন থাকবেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্টরা (২৬ জন সরকারি এবং ১৪ জন বেসরকারি) সরকার মনোনীত। কেন্দ্রীয় আইনসভায় গভর্ণর জেনারেলের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সরকারি ঋণ, অর্থ বা রাজস্ব, ধর্ম, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে কোনো বিল উত্থাপনের ক্ষমতা ছিল না।

নতুন এ আইনে সকল প্রদেশের জন্য একটি করে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া প্রাদেশিক আইনসভার গঠন কাঠামো ও সম্প্রসারণ করা হয়। নির্বাচিত, সরকারি এবং বেসরকারি এই তিন ধরনের সদস্য নিয়ে এ আইনসভা গঠিত হবে। এ আইনে বিধান করা হয় যে, সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাচিত এবং বাকিরা মনোনীত হবেন। দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। তবে রাষ্ট্রের যেকোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং প্রাদেশিক সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল। এই আইন প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

প্রাদেশিক বিষয়সমূহকে 'সংরক্ষিত' (Reserved) এবং 'হস্তান্তরিত' (Transferred) এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। গভর্ণর এবং তার নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ 'সংরক্ষিত' বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন। আর 'হস্তান্তরিত' বিষয়সমূহ গভর্ণর ও তার মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত করা হয়।[৭]

মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। তারা আইনসভার কাছে এক অর্থে দায়ী ছিলেন। 'হস্তান্তরিত' বিষয়ে গভর্ণর সাধারণত মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন। সীমিত আকারে ভোটাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বেসরকারি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল এই আইনের উল্লেখযোগ্য দিক।

মন্টেগু চেমর্সফোর্ড আইনে ১৩৯ জন সদস্য নিয়ে এক কক্ষ বিশিষ্ট বঙ্গীয় আইনসভা গঠিত হয়। এদের মধ্যে ১১৪ জন নির্বাচিত সদস্য এবং অবশিষ্টরা সরকার ও বেসরকারি মনোনীত সদস্য ছিলেন। মুসলমান সদস্য সংখ্যা পূর্বের ৫ জন থেকে ৩৯ জনে উন্নীত করা হয়।[৮] দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অধীনে যথাক্রমে ১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চারটি বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত নির্বাচনকালীন সময়ে ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ, খেলাফত ও আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। বৃটিশ বিরোধী এই সব আন্দোলনের কারণে এবং বৃটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কার আইন অপর্যাপ্ত ঘোষণা ধরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বঙ্গীয় আইনসভার ১৯২০ সালের নির্বাচন বর্জন করলে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ১৯২৩ সালের বঙ্গীয় আইনসভায় স্বরাজবাদী এবং মুসলিম লীগ যথাক্রমে প্রধান এবং ২য় সংসদীয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৬ এবং ১৯২৯ সালে ৩য় এবং ৪র্থ আইনসভায় স্বরাজপন্থীরা তাদের নিজস্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুন্ন রাখে। আইন পরিষদে স্বরাজপন্থীরা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পন্থা গ্রহণ করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপকে সমর্থন প্রদান এবং আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৯] বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের আলোচনায় যেসব বিষয় গুরুত্ব পায় তা হলো কৃষক, শ্রমিক ও রাজবন্দীদের উপর সরকারি নির্যাতন, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি। এছাড়া বঙ্গীয় আইনসভায় সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে Nizam Ahmed এর The Parliament of Bangladesh গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Members were allowed freedom of speech and vote. They also enjoyed immunity for whatever they said or the way they voted in the council. No member was liable to proceedings in any court for his speech or vote in the chamber or for anything published in any official report of the proceedings of the council. Members were given the right to ask questions and to move bills, resolutions and adjournment motions".[১০] এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আইনসভায় সদস্যদের ভোটে মন্ত্রীদের বেতন বিল, Criminal Law Amendment Bill নাকচ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। কখনো মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত ও তা গৃহীত হয়।[১১]

প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যগণও বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে দাবী দাওয়ার ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ উলেখ করা যায় যে, ১৯২১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রায় যদুনাথ মজুমদার আইন পরিষদে উত্থাপিত এক প্রস্তাবে প্রথম কাউন্সিলের মেয়াদ শেষ হবার পরপরই প্রদেশগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং কেবলমাত্র সেনাবাহিনী ও বৈদেশিক দপ্তর ব্যতীত সকল কেন্দ্রীয় বিভাগ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করার দাবী জানান।

যমুনা দাস, দূর্গাদাস ঐ প্রস্তাবের একটি সংশোধনী উত্থাপন করেন। সংশোধনীতে তিনি সপরিষদ বড়লাটকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সর্বোত্তম পন্থা নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেন। ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি দেওয়ান বাহাদুর রংগচরিয়ার সংস্কার সাধনে ভারত সচিবের অস্বীকৃতিতে নিদারুন ক্ষোভ ব্যক্ত করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বেশ কিছুটা বিশদ আলোচনার পর প্রস্তাবটি মূলতবী থাকে। হরি সিং গৌর ১৯২৩ সালের ১৮ জুলাই আরেকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে সংবিধানের আওতায় অধিকতর সংস্কার পরিচালনার ব্যাপারে ভারত সচিব প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান হয়। ঐ প্রস্তাবটি ৪৩-৩০ ভোটে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অনুমোদিত হয়।[১২]

১৯১৯ সালের আইনে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচনের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণ সীমিত আকারে হলেও সরকার ও বিরোধী দলের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দ্বৈত শাসনের মাধ্যমে প্রদেশে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা গভর্ণর কেন্দ্রীক হওয়ার ফলে তা কার্যকরী হয়নি। তাছাড়া জনগণের ভোটাধিকার সীমিত থাকার কারণে ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা পায়নি। প্রতিনিধিত্বশীল সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত বিরোধী দল এবং মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা (Collective Responsibility) ও দায়বদ্ধতা (Accountability)। কিন্তু এই আইনে এসব বিষয় লক্ষ্য করা যায় না।

১৯১৯ সালের আইনে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক কার্যকর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও এদেশে সংসদীয় দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি ছিল সর্বপ্রথম কার্যকর পদক্ষেপ। নিম্নে বঙ্গীয় আইন পরিষদের একটি সারণি দেওয়া হলো:

সারণি – ৩.১

বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৮৬২-১৯৪৫

আইন পরিষদ/সংসদ	যে আইন/সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য/পাশকৃত আইন
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৮৬২-১৮৯২	১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	১২	৪ জন সরকারি, ৪ জন বেসরকারি কিন্তু ইউরোপিয়ান এবং বাকী ৪ জন বাঙালি।	সকল সদস্য গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত। ১৮৬২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত ৩০ বছরে মাত্র ৪৯ জন বাঙালি সদস্য হন। ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট পাস।
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৮৯২-১৯০৪	১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	২০	১৩টি আসনে সরাসরি গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত। বাকী ৭ জন সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত পরে গভর্ণর কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত।	প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ দান। পরিষদে বাজেট উত্থাপিত হতো। কিন্তু ভোটে দেওয়া হতো না। পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা। ১৮৯৩ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সদস্য ছিলেন।
পূর্ববঙ্গ ও আসাম আইন পরিষদ ১৯০৫-১৯১২	ঐ	২০		মাত্র ১২ দিন বৈঠক করে ১০টি আইন পাস হয়। বঙ্গভঙ্গ জনিত পরিস্থিতির কারণে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিরা পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ দেখান।
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯০৯-১৯১৯	১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	৫০		
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯২১-১৯২৩	১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন।	১৪০	২৬ জন মনোনীত। বাকী সদস্যরা নির্বাচিত।	১৬৪ দিনের বৈঠকে ৩৪৪৯টি প্রশ্ন, ৩১৪টি প্রস্তাব উত্থাপিত এবং ২৪টি আইন পাশ। ১৩টি বেসরকারি বিলে ২টি পাশ। বাজেট উত্থাপিত ও আলোচিত হয়।
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯২৪-১৯২৬	১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন।	১৪০	২৬ জন মনোনীত। বাকী সদস্যরা নির্বাচিত।	১৩টি আইন পাশ হয়। ২টি বেসরকারি বিল গৃহীত হয়। সি. আর. দাস, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আব্দুর রহিম

				এরা সদস্য হন।
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯২৭-১৯২৯	১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন।	১৪০	২৬ মনোনীত। বাকী সদস্যরা নির্বাচিত	স্বরাজ পার্টির অধিকাংশ হিন্দু আসন লাভ। ১০০০ এর অধিক প্রশ্ন, ৩০৯টি প্রস্তাব উত্থাপিত এবং কয়েকটি আইন পাশ হয়।
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯৩০-১৯৩৬	১৯১৯ সালের ভারতায় কাউন্সিল আইন।	১৪০	২৬ জন মনোনীত। বাকী সদস্যরা নির্বাচিত।	কংগ্রেস নির্বাচন বর্জন করে। ফজলুল হক ও খান বাহাদুর আব্দুল মমিন মুসলিম লেজিসলেটিভ এসোসিয়েশন গঠন করেন। কংগ্রেসের পরামর্শে স্বরাজ পার্টির ৩৫ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। ৪০৬০টি প্রশ্ন, ১১৮টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং ১০০টি আইন পাশ হয়।
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯৩৭-১৯৪৫	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন		ভোটাধিকার সম্প্রসারিত।	ফজলুল হকের প্রথম (১৯৩৭-৪১), দ্বিতীয় (১৯৪১-৪৩) নাজিমুদ্দিনের (১৯৪৩-৪৫) ও সোহরাওয়ার্দীর (১৯৪৬-৪৭) মন্ত্রিসভা গঠন।

উৎস: ফিরোজ, জালাল (২০০৩), *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ২১-২২।

ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৩৫ সালের আইনে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিধান রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আইনে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসনের আওতায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। উচ্চ কক্ষের নাম Council of State বা রাজ্য সভা এবং নিম্নকক্ষের নাম Federal Assembly বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা। উচ্চকক্ষ ১৫৬ জন বৃটিশ ভারতের এবং সর্বোচ্চ ১০৪ জন দেশীয় রাজ্যের সর্বমোট ২৬০ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।

নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ৩৭৫ জন। এর মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি ২৫০ জন এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি সর্বোচ্চ ১২৫ জন। এই আইন দ্বারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে প্রদেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রীবর্গ তাদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক-

তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করা ছিল এই আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১৩]

সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গভর্ণর জেনারেল বৃটিশ রাজা বা রাণী কর্তৃক ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন। ভারত সচিবের মাধ্যমে তিনি তার কাজের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী ছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার জন্য তার সর্বোচ্চ ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদ এবং অনধিক ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রীসভা ছিল। এদের তিনি নিযুক্ত এবং প্রয়োজনে পদচ্যুত করতে পারতেন। নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণও সম্পূর্ণ তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। গভর্ণর কেন্দ্রীয় আইনসভার যে কোনো অধিবেশন আহ্বান করতে এবং স্থগিত রাখতে পারতেন। এমনকি নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে দিতে পারতেন। কোনো বিলে সম্মতি দান করা বা না করা তার সম্পূর্ণ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি বিল আইনসভায় ফেরৎ পাঠাতে পারতেন। যে কোনো বিলে 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা তার ছিল। তার সম্মতি ব্যতীত কোনো বিল আইনে পরিণত হতো না। অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে তিনি আইন পাশ করতে পারতেন। কতিপয় বিষয়ে বিল উত্থাপনের জন্য তার পূর্ব অনুমতি আবশ্যক ছিল। প্রয়োজনে তিনি প্রদেশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। এবং বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার অধিকার তার ছিল।[১৪]

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধীনে বঙ্গীয় দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম ছিল Legislative Council এবং নিম্ন কক্ষের নাম ছিল Legislative Assembly; উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৩-৬৫ জন। এদের মধ্যে ৩-৫ জন গভর্ণর দ্বারা মনোনীত, ২৭ জন Legislative Assembly সদস্যদের কর্তৃক এবং অবশিষ্টরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ছিলেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মুসলমানদের জন্য ১৭টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। অপরদিকে নিম্নকক্ষ ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল। এদের মধ্যে ১১৭টি আসন মুসলমানদের জন্য, ৭৮টি আসন হিন্দুদের জন্য (এর মধ্যে ৩০টি ছিল নিম্নবর্ণ হিন্দুদের) এবং বাকী অবশিষ্ট ৫৫টি আসন বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। বিশেষ স্বার্থের জন্য সংরক্ষিত আসন বাদে অন্যসব আসন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এলাকাভিত্তিক নির্বাচিত ছিল।[১৫]

১৯৩৫ সালের আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলেও কেন্দ্রীয় গভর্ণর জেনারেলের ন্যায় প্রাদেশিক গভর্ণর ও একই রকম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আইনসভার নিকট দায়ী না থেকে ব্রিটিশ সরকারের নিকট দায়ী থাকতেন। আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা, মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্যবাধকতা না থাকা, মন্ত্রীসভা বাতিল করে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন, সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে ভেটো প্রদান, বিল পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠানো এবং অর্ডিন্যান্স জারী করার ক্ষমতা তার ছিল।[১৬]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি এবং বিভিন্ন গ্রুপ অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনী ফলাফলে কংগ্রেস ৫২, স্বতন্ত্র হিন্দু ৩৯, হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ৩, হিন্দু মহাসভা ২, স্বতন্ত্র মুসলিম ৪৩, লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড ৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬, তিপেরা কৃষক সমিতি ৫, ইউরোপিয়ান গ্রুপ ২৫, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪ এবং ইন্ডিয়ান খৃস্টান ২টি আসন লাভ করে।[১৭] কংগ্রেস এককভাবে সর্বাধিক আসন লাভ করলেও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। নিম্নে বঙ্গীয় আইনসভার ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ফলাফলের চিত্র দেখানো হলো।

সারণি – ৩.২

বঙ্গীয় আইনসভার ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ফলাফল

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা
কংগ্রেস	৫২
মুসলিম লীগ	৩৯
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৬
তিপেরা কৃষক সমিতি	৫
স্বতন্ত্র মুসলিম	৪৩
স্বতন্ত্র হিন্দু	৩৯
হিন্দু ন্যাশনালিস্ট	৩
হিন্দু মহাসভা	২
ইউরোপিয়ান গ্রুপ	২৫
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
ইন্ডিয়ান খৃস্টান	২
মোট	২৫০

উৎস: Islam, Syed Serajul (1992), *Bangal Legislative Assembly and Constitutional Development*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, p. 293.

নির্বাচনের পর সরকার গঠনের অভিপ্রায়ে কিছু স্বতন্ত্র মুসলিম সদস্য মুসলিম লীগে এবং কিছু কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দান করে। এক্ষেত্রে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা হয় ৬০ এবং কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য সংখ্যা ৫৮-তে পৌছায়। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ এবং কৃষক প্রজা পার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করে। এই মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগ দলীয় মন্ত্রী ছিলেন, খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, নবাব মোশার্‌রফ হোসেন, কৃষক প্রজা পার্টির এ. কে. ফজলুল হক এবং সৈয়দ নওশের আলী, স্বতন্ত্র হিন্দু সদস্য নলিনী রঞ্জন সরকার, শ্রীশ চন্দ্র নন্দি, বি. পি. সিং রয়, সিডিউল কাষ্টের

প্রসন্ন দেব রাইকাত এবং মুকুন্দ বিহারী মল্লিক। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক এই মন্ত্রীসভায় মুখ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।[১৮]

ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। এ মন্ত্রীসভা বাংলায় শিক্ষার সুযোগ বিস্তার, জমিদার মহাজনদের হাত থেকে প্রজাদের পরিত্রাণ দানে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধীনে বঙ্গীয় আইনসভার দ্বিতীয় নির্বাচন ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষ নির্বাচন। নির্বাচনী ফলাফলে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কংগ্রেস পায় ৮৬টি আসন। নিম্নে বঙ্গীয় আইনসভার ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী ফলাফল দেখানো হলো।

সারণি – ৩.৩

বঙ্গীয় আইনসভার ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী ফলাফল

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা
মুসলিম লীগ	১১৪
কংগ্রেস	৪৬
কৃষক প্রজা পার্টি	৪
সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন	১
স্বতন্ত্র মুসলিম	২
হিন্দু মহাসভা	১
স্বতন্ত্র হিন্দু	৬
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
ইন্ডিয়ান খৃস্টান	২
ইমারত পার্টি	১
ইউরোপিয়ান গ্রুপ	২৫
খৃষ্টীয় সমিতি	১
কমিউনিস্ট পার্টি	৩
মোট	২৫০

উৎস: Islam, Syed Serajul (1992), *Bangal Legislative Assembly and Constitutional Development*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, p. 296.

১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করে। এ সময়ে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য এবং মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্র

গঠনের দাবীতে অনঢ় ছিল। এই ক্রান্তিকালে বৃটিশ সরকার Lord Wavell-এর পরিবর্তে Lord Mountbatten কে ভারতে ভাইসরয় হিসাবে নিয়োগ করে। Mountbatten তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭-এর জুন মাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন Bengal Legislative Assembly অধিবেশন আহ্বান করা হয়। Mountbatten পরিকল্পনাটি বঙ্গীয় আইনসভায় ১২৬-৯০ ভোটে গৃহীত হওয়ার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতে উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। একই সাথে বঙ্গীয় আইনসভার বিলুপ্তি এবং ভারত, পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে।[১৯]

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে এ অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে সংসদীয় কাঠামোর প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমবিকাশ ঘটে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ও প্রসারিত হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের সংসদীয় কাঠামোগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে জনপ্রতিনিধিত্বের ধারক না হলেও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সাধারণ নির্বাচন এসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় আইনসভার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংসদীয় বিতর্কে কেন্দ্রীয় আইনসভার চেয়েও বঙ্গীয় আইনসভা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার পরেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আইনসভা প্রবর্তিত হয়। বঙ্গীয় আইনসভাই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা করে।[২০] কেন্দ্র ও প্রদেশের নির্বাহী বিভাগের গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণর ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৭-১৯৪৭ পর্যন্ত সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধীনে বঙ্গীয় আইনসভায় সংসদীয় রীতি নীতি চর্চার সুযোগ ঘটে। এই সময়ে আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যগণ তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর ও বিলের উপর অর্ধ ঘন্টাব্যাপী আলোচনায় অংশ নেন। আইনসভার আলোচনায় বেসরকারী সদস্যদের অগ্রাধিকার ছিল।[২১] উল্লেখ্য যে, ১৯২১ সালের প্রথম ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্যগণ সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত উভয় বিষয়ে ৩১৪টি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এ সময়ে বিরোধী দলের নেতৃত্বে ছিলেন কিশোরী মহন চৌধুরী এবং সুরেন্দ্র নাথ মলিক। ১৯২৭ সালের তৃতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা ছিল ১০০০-এর বেশী। প্রশ্নের বিষয় ছিল প্রশাসন, দাঙ্গা এবং রাজবন্দী। মোট ৩০৯টি প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও আলোচিত হয়েছে মাত্র ৪০টির। ১৯২৯ সালের চতুর্থ ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক এবং সরকারি নীতি সংক্রান্ত ৪০৬০টি প্রশ্ন উঠেছিল। এর মধ্যে ১১৮টি প্রস্তাব আলোচিত হয়।[২২] উপনিবেশিক আমলে বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হলেও সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো দায়িত্বশীল সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে জবাবদিহিমূলক কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় একযোগে কাজ করে গেছেন।

পাকিস্তান পর্বঃ

জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান পর্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ, প্রতিবন্ধকতা, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিরোধী দলের আন্দোলন সংগ্রাম এ পর্যায়ের আলোচিত বিষয়। এক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক

স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এই সমস্ত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করাই পাকিস্তান পর্বের আলোচ্য বিষয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয়। প্রথম গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৯। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ৪৪ (পাঁচ জন অবাঙালি সদস্যসহ)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন গণপরিষদের সভাপতি। তিনি মারা যাওয়ার পর (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) মৌলভী তমিজউদ্দিন খান এর সভাপতি হন। পাকিস্তান সৃষ্টির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দানের পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট করাচিতে গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসেবেও কাজ করবে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রথম গণপরিষদে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি 'আদর্শ প্রস্তাব' নামে পরিচিত। আদর্শ প্রস্তাবে ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়নের কথা বলা হলে, গণপরিষদের সংখ্যালঘু সদস্যরা সাংবিধানিক বৈষম্যের কথা বলে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানান। এর ফলে লিয়াকত আলী খানের আদর্শ প্রস্তাবটি সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারায়।[২৩]

পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে গণপরিষদের সংখ্যালঘু সদস্য কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের দাবীর সন্ধিক্ষণে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে. এম. দাস লেনের রোজ গার্ডেনে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। নব গঠিত দলের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক। শুরুতে দলটির নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ হলেও পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে দলটির তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে নামের পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়। সরকারি দল মুসলিম লীগের বিপরীতে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত করে। আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন, ১৯৫৫ সালে সম্পাদিত মারি চুক্তির আওতায় পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট গঠন ও দু'অংশের মধ্যে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে 'সংখ্যা সাম্য নীতি' অনুসরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৪] যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে প্রথম বারের মত সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতামূলক সম্পর্কের উন্মেষ ঘটে।

পাকিস্তানের সংবিধানের মৌলিক বিষয় নির্বাচনের জন্য ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি মূলনীতি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন। দ্বিতীয় মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর। এবং তৃতীয় মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়

প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী কর্তৃক ১৯৫৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব, আইনসভার উভয় কক্ষের ক্ষমতা ইত্যাদি প্রশ্নে পূর্ব বাংলায় চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পাকিস্তানের উভয় অংশই এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত মতবিরোধ চলাকালে ১৯৫৪ সালের ২৫ অক্টোবর পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন।[২৫]

১৯৫৫ সালের ২৯ মে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন মোট ৮০ জন সদস্য নিয়ে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের মারিতে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সম্বন্ধে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা মারি চুক্তি নামে পরিচিত।[২৬] নিম্নে দ্বিতীয় গণপরিষদের দলীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

সারণি – ৩.৪

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের দল ও আসন সংখ্যা

দল	আসন সংখ্যা
মুসলিম লীগ	২৬
ইউনাইটেড ফ্রন্ট	১৬
আওয়ামী লীগ	১৩
নুন গ্রুপ	৩
পাকিস্তান কংগ্রেস	৪
সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন	৩
ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি	২
স্বতন্ত্র মুসলিম	১
অন্যান্য	১২

উৎস: Ahmed, Moudud (1976), *Bangladesh Constitution Quest for Autonomy,* Dhaka: UPL, p. 39.

দ্বিতীয় গণপরিষদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত মারি চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের ২৩ শে মার্চ পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সংবিধান গৃহীত ও কার্যকরী হয়। এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৭] এই সংবিধান প্রবর্তনের পিছনে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের

বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কয়েকটি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী ফ্রন্ট। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল এর মূল উদ্যোক্তা। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট ঘোষণা করা হয়।[২৮]

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলসমূহ হচ্ছে- আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩), মওলানা আতাহার আলীর নিজাম-ই-ইসলাম এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল। মধ্যপন্থী, গণতন্ত্রী, ইসলামী, বামপন্থী ইত্যাদি দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের মূল নেতৃত্বে ছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সেই সময়ের তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন এবং পূর্ববাংলার পূর্ব স্বায়ত্তশাসন প্রধান দাবীতে পরিণত হয়।[২৯] ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের মাপকাঠি। এ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে Ahmed Kamal এর State Against the Nation গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Sixty percent of the twenty million voters voted and the result was a complete disaster for the league: it only won ten seats out of the 237 Muslim seats in the Provincial Assembly. All its leaders lost their seats. Even the Prime Minister was defeated by a relatively unknown student leader in his home constituency." নির্বাচনে বিরোধী দলীয় জোট যুক্তফ্রন্ট এককভাবে ২১৫টি আসন লাভ করে। নির্বাচন পরবর্তীকালে আর ৮টি আসন ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত হলে যুক্তফ্রন্টের আসন সংখ্যা দাড়ায় ২২৩। খেলাফতে রব্বানী পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসন লাভ করে।[৩০] নিম্নে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফলের চিত্র দেওয়া হলো।

সারণি – ৩.৫

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল

দল	আসন সংখ্যা
মুসলিম আসন সংখ্যা ২৩৭	যুক্তফ্রন্ট – ২২৩ মুসলিম লীগ – ১০ স্বতন্ত্র – ৩ খিলাফতে রব্বানী – ১
অমুসলিম আসন সংখ্যা ৭২	কংগ্রেস – ২৪ যুক্তফ্রন্ট – ১০ তফসিলী ফেডারেশন – ২৭ কমিউনিস্ট পার্টি – ৪ গণতন্ত্রী দল – ৩ বৌদ্ধ – ২ খৃস্টান – ১ স্বতন্ত্র – ১

উৎসঃ Chowdhury, Najma (1980), *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-1958,* Dhaka: University of Dhaka, p. 172.

পূর্ব বাংলার গভর্ণর চৌধুরী খালেকুজ্জামানের আমন্ত্রণে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ৫৬ দিনের মধ্যে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হয়। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘনঘন রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের এক পর্যায়ে ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ১৯৫৬-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দু'বছরের মতো পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন ছিল। এই সময়ে আওয়ামী লীগ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্র ও সরকার গঠনের সুযোগ পায়। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৫৬ সালের ১১ অক্টোবর থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ১৩ মাস ক্ষমতাসীন ছিল।[৩১] ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলায় পার্লামেন্টের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টভুক্ত বিরোধী দলগুলি প্রাদেশিক পরিষদে সরকারি দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিরোধী দলের আসনে অধিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ।

পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রথম দশকে পূর্ব বাংলার দু'টি সংসদীয় সভা যথাক্রমে ১৭১ এবং ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এ সময়ে মুসলিম লীগের একচেটিয়া মনোভাবের কারণে ১৯৪৭-১৯৫৪ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার আইনসভার কাঠামো ছিল দূর্বল। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংসদে স্পীকারও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হননি। ১৯৫৪ সালে গঠিত সংসদ স্থায়িত্ব, সংহতি ও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের কারণে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। এই পরিষদের ৭৮ কর্ম দিবসে মাত্র ৬৮টি আইন অনুমোদিত হয়। সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য সংসদীয় অধিকারের প্রয়োগ ছিল অপর্যাপ্ত।[৩২] নিম্নে সংসদে সময় বণ্টনের শতকরা হার দেখানো হলো।

সারণি – ৩.৬

সংসদে সময় বণ্টনের শতকরা হার

	প্রথম পরিষদ	দ্বিতীয় পরিষদ
আইন প্রণয়ন	৩৮	১০
বাজেট	৩০	৪৩
প্রশ্নোত্তর	২২	২৬
মুলতবি প্রস্তাব	২	৬
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসহ অন্যান্য	৪	৩
পয়েন্ট অফ অর্ডার, তথ্য এবং স্পীকারের রুলিং	২	৭
অন্যান্য বিষয়াবলী	২	৫
মোট	১০০	১০০

উৎসঃ Chowdhury, Najma (1980), *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-1958,* Dhaka: University of Dhaka, p. 266.

১৯৫৪ সালের সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য এবং সহনশীলতার অভাবে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক চরম অবনতিশীল পর্যায়ে উপনীত হয়। সরকার ও বিরোধী দলের এইরূপ বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয় যার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন ডেপুটি স্পীকার শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় পরিষদে সংসদীয় আচরণবিধিতে সংশোধন আনয়ন করা হলেও সংসদীয় কার্যক্রমে এর প্রভাব পড়েনি। সংসদে দলগুলোর মধ্যে সরকার গঠনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে সংসদ কার্যকর হতে পারেনি। এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, "The dominance of the Muslim League and the attitude of the government during 1947-1954 did not allow the assembly to assert itself. Fragmentation of the parties, ministerial

instabilities and the instances of suspension of parliamentary government during 1954-1958 prevented the legislature from acquiring a strong and vigorous existence".[৩৩]

পাকিস্তানের প্রথম দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতার আবর্তে কেন্দ্র ও প্রদেশে প্রতিনিয়ত সরকারের পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত অব্যাহত থাকে। ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণীত হওয়ার পরও তা লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্র ও প্রদেশে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও তা কার্যকরী হতে পারেনি। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ডে সংসদীয় রীতিনীতি সম্বলিত সংসদ বিনির্মাণে ইতিবাচক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। পূর্ব বাংলার আইনসভার সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The behaviour of the second assembly was, on the whole, disorderly and unruly and on occasions utterly unpredictable".[৩৪] সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি থাকাটা ছিল প্রয়োজনীয়। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় রাজনেতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিরোধী দল তাদের অবস্থানকে সুসংহত করতে পারেনি। এই কারণে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "True, the opposition was not in a position to make the M. L. Government behave properly, either in the centre or in the provinces".[৩৫] নিম্নে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের একটি চিত্র দেখানো হলো।

সারণি – ৩.৭

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ

আইন পরিষদ/সংসদ	যে আইন/সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য/পাশকৃত আইন
পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ১৯৪৭-১৯৫৪	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।	১৭১	১৪১ জন অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্য। বাকী ৩০ জন আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার নির্বাচিত সদস্য। ০২ জন নারী।	পাকিস্তানে আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থা শুরু।
পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৫৪-১৯৫৮	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধিত (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ) রূপ	৩০৯	১২ জন নারী	যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ।
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৬২-১৯৬৫	১৯৬২ সালের আয়ুবী সংবিধান	১৫৫	৫টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত	মোট ভোটার ৪০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রের। পরিষদের মেয়াদকাল ৫ বছর। এ.টি.এম. মোস্তফা সংসদ নেতা। আখতার উদ্দিন আহমেদ বিরোধী দলের নেতা। আব্দুল মালেক উকিল আওয়ামী লীগ গ্রুপের নেতা।
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৬৫-?	১৯৬২ সালের আয়ুবী সংবিধান।	-		

উৎস: ফিরোজ, জালাল (২০০৩), পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ২২।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কেন্দ্র ও প্রদেশের আইনসভা এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগকে অকার্যকর ঘোষণা করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে শামরিক শাসন জারি করেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোকে সরাসরি দায়ী করলেও সময়ের আবর্তে এ সময়টি ছিল পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্মেষ কাল। সঙ্গত কারণেই সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। ইস্কান্দার মির্জার সামরিক শাসন জারির ২০ দিনের মধ্যে সেনা প্রধান আইয়ুব খান পাল্টা সামরিক

অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করেন।[৩৬] এভাবে শামরিক শাসক কর্তৃক ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটে।

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ঘোষণা করেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে দেশের নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হয়। এদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন বলে বিধান করা হয়। আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের পরোক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া, উদারনৈতিক, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিক ব্যহত করে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধান রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করে। এই সংবিধানে এক-কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার আওতায় কেন্দ্র ও প্রদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করার কথা বলা হয়। সাংবিধানিক চিঠিতে যেকোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার থাকায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন উপেক্ষিত হয়ে পড়ে।[৩৭]

১৯৬২ সালের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংসদীয় কাঠামোর অনুকরণে এর কার্যপ্রণালী বিধি ছিল এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব মূলতবি প্রস্তাবের মতো কিছু সংসদীয় বিধিও রাখা হয়। এ সকল সংসদীয় বিধি মূলত নির্বাহী কর্মকাণ্ডের তদারকিতে অকার্যকর ছিল। ১৯৬২-১৯৬৫ কালীন সময়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা ৩৯টি সরকারি বিল ও ১টি বেসরকারি বিল অনুমোদন করে এবং প্রায় তিন হাজারের মতো প্রশ্ন উত্থাপনসহ নয়শ'র অধিক প্রস্তাবনা পেশ করে। প্রাদেশিক আইনসভা গভর্ণর এবং ১৫৫ জন সদস্য নিয়ে পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়েছিল। এই আইনসভার মর্যাদা ও ক্ষমতা কেন্দ্রিক আইন সভার অনুরূপ হলেও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের সংসদীয় বিতর্ক বা কমিটি কর্ম সম্পাদন রীতিমত আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় সংসদ একটি দূর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সংসদে রাষ্টপতির ভেটো ক্ষমতা থাকলেও সংসদের নিকট রাষ্ট্রপতির কোনো জবাবদিহিতা ছিল না।[৩৮] এরূপ সাংবিধানিক আইনে শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

আইয়ুব খানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। এই প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার করে। আইয়ুব শাসন বিরোধী আন্দোলনে, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালের ২৪ জুন ৯ নেতার বিবৃতি এবং ১৯৬২ সালের ৪ আগস্ট আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক মোর্চা কর্তৃক গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন. ডি. এফ.) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের সংবিধানের আওতায় ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হন। এই নির্বাচনে আইয়ুবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত

বিরোধী দল মিস্ ফাতেমা জিন্নাহকে তাদের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেন। রাষ্ট্রপতি পদে এই মনোনয়নের উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করা।[৩৯]

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে ছয়-দফার দাবীতে। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঐতিহাসিক ছয়-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয়-দফায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দাবী জানানো হয়।[৪০] এ প্রসঙ্গে Dilara Choudhury এর Constitutional Development in Bangladesh Stresses and Strains গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Such a political order, according to the Bengali intelligentsia, could rectify the situation in which they suffered from acute economic deprivation and political domination".[৪১]

ছয়-দফার ন্যায় ছাত্র সমাজের এগার দফায় এবং ৮টি রাজনৈতিক দল কর্তৃক গঠিত (Democratic Action Committee) DAC এর কর্মসূচিতেও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির গোলটেবিল বৈঠকেও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুরূপ দাবী উত্থাপিত হয়।[৪২] ছয়-দফা এবং সম্প্রসারিত এগার দফা ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন দাবীতে পরিণত হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছয়-দফা ও এগার দফায় নির্বাচনী অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগ কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নিম্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সারণি – ৩.৮

পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	৭২.৫৭
ন্যাপ (মস্কোপন্থী)	৩৬	-	১.৮৩
ন্যাপ (পিকিং পন্থী)	১৫	-	.৩০
ইসলাম-পছন্দ দলসমূহ	৫১৫	১	১৭.৮৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৩৯	১	৭.৭২
সর্বমোট	৮৬৭	১৬২	১০০

উৎস: হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, পৃ. ২৮২।

সারণি – ৩.৯

পশ্চিম পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
পাকিস্তানি পিপল্‌স পার্টি (পিপিপি)	১১৯	৮১	৪২.২
মুসলিম লীগ (কনভেনশন) মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৫৮	১১	১০.২
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৬৯	৭	১০.৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি.ডি.পি.)	২৭	-	১.৮
জামায়াত-ই-ইসলামী	৭৯	৪	৬.৫
অন্যান্য ইসলামী দল	১৪৭	১৪	১০.২
ন্যাপ (মস্কোপন্থী) ন্যাপ (পিকিংপন্থী) আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৯ ৪ ৯ ২২৩	৬ - - ১৫	১৮.৫
সর্বমোট	৮৫৪	১৩৮	১০০

উৎস: হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, পৃ. ২৮৩।

সারণি – ৩.১০

পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	সর্বমোট
আওয়ামী লীগ	২৮৮	-	২৮৮
পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি (পি.পি.পি.)	-	১১৪	১৪৪
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	২৪	২৪
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি)	১	২১	২২
কনভেনশনাল মুসলিম লীগ	-	২০	২০
মারকাজি জামায়াত-ই-ওলামা	-	১১	১১
জামায়াতে ওলামা (হাজরাভি)	-	৮	৮
পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	৮	৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	৪	৬
জামায়াতে ইসলাম	১	৩	৪
অন্যান্য	১	৪	৫
স্বতন্ত্র	৭	৫৩	৬০
সর্বমোট	৩০০	৩০০	৬০০

উৎস: Chowdhury, G. W. (2011), *The Last Days of United Pakistan,* Dhaka: University Press Limited, p. 128.

১৯৭০ সালের প্রথম এবং শেষ জাতীয় নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ৮৮টি আসন পেয়ে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের স্থান লাভ করে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালির প্রদত্ত নির্বাচনী রায় প্রত্যাখ্যাত হলে, নয় মাস ব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মলাভ ঘটে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, উচ্চপদস্থ বেসামরিক সরকারি কর্মচারীদের রাজনীতির উপর অনধিকার প্রভাব বিস্তার। প্রাদেশিক শাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্র ও প্রদেশে মন্ত্রীসভার দ্রুত রদবদল। এছাড়া পাকিস্তানের সংসদীয় রাজনীতির কাঠামোয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ কোন্দল, আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সন্দেহ প্রবণ ও বিরোধীতাপূর্ণ সম্পর্ক ও পাকিস্তানের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উপর ১৯৫৮ সালের সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটলেও উল্লিখিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামরিক হস্তক্ষেপের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

স্বাধীনতা উত্তর পর্যায়ঃ

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, জাতির প্রতি তার দীর্ঘ অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে একটি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারী করেন। অস্থায়ী সংবিধান আদেশে বলা হয়, দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন এর প্রধান। রাষ্ট্রপতি হবেন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন এমন একজন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।[৪৩] মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধাবস্থা ক্রিয়াশীল রাখার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় উত্তরনকে নি:সন্দেহে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন হিসেবে গণ্য করা হয়। নব্য স্বাধীন দেশে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের প্রেক্ষাপটে জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে Ali Riaz-এর Inconvenient Truths about Bangladesh Politics গ্রন্থে বলা হয়েছে "The promise of an inclusive democracy and a just society marked the beginning of the regime of Sheikh Mujibur Rahman (Mujib). Policies such as nationalization and pledges of land reforms were matched with socialist and egalitarian rhetoric, demonstrating the populist agenda of the regime".[৪৪]

বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় প্রথম সংবাদ সম্মেলনে জনগণের জন্য প্রথমেই একটি সংবিধান রচনার অঙ্গীকার করেন।[৪৫] এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' (রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আদেশ) জারী করেন। এই আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) হতে যেসকল গণপ্রতিনিধি সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠিত হয়।[৪৬] ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপী এই অধিবেশনে কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়।[৪৭]

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ১৮ এপ্রিল ১৯৭২ প্রস্তাবিত সংবিধানের মুখবন্ধ (Preamble) নির্ধারণ করেন। এই সভা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের (Unitary State) ধারণার স্বপক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জুন খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির শেষ বৈঠকে সংবিধানের প্রাথমিক খসড়াটি অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একে আরও পূর্ণাঙ্গ ও যথাসম্ভব ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য কমিটির সভাপতি কামাল হোসেন ভারত ও ব্রিটেন সফর করেন। তিনি উভয় দেশের পার্লামেন্টের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেন ও দেশে ফিরে উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতা কাজে লাগান।[৪৮] সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় এমন রাজনৈতিক দলগুলো খসড়া সংবিধানের কঠোর সমালোচনা করে। এসব দলগুলোর মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্র ইউনিয়ন। এই সমস্ত দলগুলো গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, "বর্তমান গণপরিষদ ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। এরা আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবী আদায়ের ম্যান্ডেট পেয়েছিল। অতএব সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের কোন অধিকার এদের নেই"।

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাশারও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সম্মেলনে সংবিধান প্রণয়ন ও গণভোটের মাধ্যমে গ্রহণ করার আবেদন জানান। অপরদিকে খসড়া সংবিধানের প্রতি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর) যথেষ্ট নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। কারণ সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মৌলিক অধিকারের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।[৪৯]

অবশেষে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান বিল গণপরিষদে পাশ করা হয় এবং তা ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়।[৫০] বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সংবিধানটি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "শহীদের রক্তে লেখা সংবিধান"। ১৯৭২ সালে সংবিধানটি রচিত হলেও এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে ছয়-দফা এবং এগার-দফা কর্মসূচিতে সার্বভৌম সংসদ এবং সংসদীয় সরকার পদ্ধতির দাবী জনদাবীতে পরিণত হয়। পাকিস্তান পর্বের ২৩ বৎসরের মুক্তি সংগ্রামের জনদাবীর গর্ভ থেকেই ১৯৭২ এর সংবিধানের উন্মেষ ঘটে। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসেবে বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই সংবিধানের মাধ্যমেই বাংলাদেশে ওয়েস্ট মিনিস্টার পদ্ধতির সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সূচনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে Moudud Ahmed এর Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman গ্রন্থে বলা হয়েছে, "The Constitution of Bangladesh envisaged a Westminister type of parliamentary system reflecting the aspirations of the people nurtured for nearly two decades. The Awami League's commitment since its inception for the establishment of a real living democracy for which they struggled and suffered for so many years could now be fulfilled because of the absolute power of the government".[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উল্লিখিত শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তৎকালে বৃটেনে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে বৃটিশ ভারতীয় উপনিবেশেও সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলে শাসন কাঠামো গড়ে তোলা হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বৃটিশ শাসনামলেই শাসনতান্ত্রিক পরিষদকে আইন পরিষদে রূপান্তর করা হয়। জনগণকে আইনসভার সদস্য মনোনীত করা, সংসদে প্রশ্ন করার বিধান প্রচলন, বাজেট আলোচনায় সম্পৃক্ত করা, বিভিন্ন বিষয়ে সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন এবং সীমিত আকারে হলেও মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। নির্বাচনী নীতি প্রবর্তন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে বৃটিশ শাসকবৃন্দের এদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিনির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইনসভায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহ-অবস্থান লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে বঙ্গীয় আইন পরিষদে ১৯৩৭-১৯৪৬ সময়কালে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সংসদীয় রীতি-নীতি পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দলীয় সদস্যগণ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদেই সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল। বিষয়টি ১৯৫৬ সালের সংবিধানে গৃহীত ও কার্যকরী করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি যে ব্যাপক জনসমর্থন ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে। দলীয় সংকীর্ণতার আবর্তে ঘনঘন সরকার পরিবর্তন, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সংসদীয় রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়া এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে ১৯৫৮ সালের সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে। ১৯৬২ সালে সেনা শাসক আইয়ুব খান প্রবর্তিত সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। এছাড়া আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের প্রতিবাদে সমগ্র পাকিস্তানে আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা এবং ১৯৬৯ সালের ১১ দফা কর্মসূচিতে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। পাকিস্তানী শাসনামলে সম্মিলিত রাজনৈতিক দলসমূহের মূল দাবীই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই দাবীর প্রতি জনসমর্থনের প্রতিফলন ঘটে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি ও রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের কঠোর পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে ফিরে ১১ জানুয়ারি এক সাংবিধানিক আদেশ জারির মাধ্যমে দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানেও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, বৃটিশ ভারতের বঙ্গীয় আইন পরিষদ এবং পশ্চিম পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সরকার ও বিরোধী দলের সহ-অবস্থান লক্ষণীয় হলেও উপনিবেশিক ও কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের কারণে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১। Chakraborty, Ratan Lal (1992), 'Sepoy Uprising 1857', Islam, Sirajul, ed., *History of Bangladesh 1704-1971*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, pp. 206-207.

২। রশিদ, হারুন-অর (২০১৩), *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ৮৭।

৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৮৯।

৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১।

৫। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ১৭।

৬। রশিদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩।

৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৬।

৯। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯।

১০। Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh*, England: Ashgate Publishing Company, p. 26.

১১। রশিদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

১২। হক, মোজাম্মেল (১৯৭৬), *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা: বুক হাউজ, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯।

১৩। রশিদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১।

১৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-১০৪।

১৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

১৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

১৭। Rashid, Harun-or (2003), *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947*, Dhaka: The University Press Limited, p. 74.

Dhaka University Institutional Repository

১৮। Islam, Syed Serajul, *Bengal Legislative Assembly and Constitutional Development,* Islam Sirajul, ed., *op.cit.,* p. 293.

১৯। *Ibid,* pp. 295-296.

২০। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

২১। Islam, Sirajul, ed., *op.cit.,* p. 297.

২২। হোসেন, শওকত আরা (১৯৯০), *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬, অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি,* ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১৩-১৬১।

২৩। রশীদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯৭-২০০।

২৪। পাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৭।

২৫। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯৮-২০২।

২৬। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯৮-২০৪।

২৭। হোসেন, শওকত আরা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২১।

২৮। Chowdhury, Najma (1980), *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-1958,* Dhaka: University of Dhaka, pp. 143-158.

২৯। রশীদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮৬-১৮৮।

৩০। Chowdhury, Najma, *op.cit.,* p. 171.

৩১। রশীদ হারুন-অর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০৯-২১১।

৩২। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১।

৩৩। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১।

৩৪। Chowdhury, Najma, *op.cit.,* p. 323.

৩৫। Harun, Shamsul Huda (1984), *Parliamentary Behavior in a Multinational State, 1947-1958 Bangladesh Experience,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, p. 104.

৩৬। রশীদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১৬-২১৭।

৩৭। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২৩-২২৬।

৩৮। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পাগুক্ত,* পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। রশীদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩-২৪৮।

৪০। Maniruzzaman, Talukder (2003), *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Mowla Brothers, p. 78.

৪১। Chowdhury, Dilara (1995), *Constitutional Development in Bangladesh Stresses and Strains*, Dhaka: University Press Limited, p. 99.

৪২। রশীদ, হারুন-অর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২-২৯৯।

৪৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

৪৪। Riaz, Ali (2013), *Inconvenient Truths about Bangladesh Politics*, Dhaka: Prothoma Prokashan, p. 2.

৪৫। Jahan, Rounaq (2005), *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Dhaka: University Press Ltd., p. 106.

৪৬। হক, আবুল ফজল (১৯৯০), *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮৮।

৪৭। Jahan, Rounaq, op.cit., p. 107.

৪৮। ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ (১৯৮৯), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা: রয়েল লাইব্রেরী, পৃ. ২৫।

৪৯। হক, আবুল ফজল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২-৯৪।

৫০। Jahan, Rounaq, *op.cit.*, p. 107.

৫১। Ahmed, Moudud (1991), *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: University Press Ltd., p. 124.

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ : সরকার ও বিরোধী দলের দলগত অবস্থান এবং সম্পর্ক

ভূমিকা

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম, সামরিক শাসন, সামরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া, সংবিধান সংশোধন, সেনা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি শাসিত আইনসভার কার্যক্রম এবং সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং এই গণআন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক জাতীয় ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধানটি গৃহীত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার সাংবিধানিক ম্যানডেট অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ১,৮৮,৫১,৮০৮টি, যা তালিকাভুক্ত ভোটার সংখ্যার ৫৫.৬২ শতাংশ। স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ১০৭৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আওয়ামী লীগ ২৮৯ আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে যা প্রদত্ত ভোটের ৭৩.২০ শতাংশ। অন্যান্য দলের ভোট প্রাপ্তির পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মস্কোপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর) ৮.৩৩, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৬.৫২, চীন পন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) ৫.৩২ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ পায় প্রদত্ত ভোটের ৫.২৫ শতাংশ। এই নির্বাচনে জাসদ ১টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ৫টি আসনে জয়লাভ করে।[১] নিম্নের সারণিতে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি – ৪.১

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	প্রতিদ্বন্দ্বী আসন সংখ্যা	জয়ী আসন সংখ্যা	জয়ী আসনের শতকরা হার	বৈধ ভোটের সংখ্যা	বৈধ ভোটের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	২৮৯	২৮২	৯৭.৫৮	১৩৭৯৩৭১৭	৭৩.২০
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	২২৪	-	-	১৫৬৯২৯৯	৮.৩৩
জাসদ	২৩৭	০১	০.৩৫	১২২৯১১০	৬.৫২
ন্যাপ ভাসানী	১৬৯	-	-	১০০২৭৭১	৫.৩২
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	০৮	০১	০.৩৫	৬২৩৫৪	০.৩৩
বাংলা জাতীয় লীগ	১১	-	-	৫৩০৯৭	০.২৮
সিপিবি	০৪	-	-	৪৭২১১	০.২৫
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	-	-	৩৮৪২১	০.২০
সিপিবি (লেনিনবাদী)	০২	-	-	১৮৬১৯	০.১০
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	০৩	-	-	১৭২৭১	০.০৯
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	০৩	-	-	১১৯১১	০.০৬
বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	০১	-	-	৭৫৬৪	০.০৪
বাংলা জাতীয় কংগ্রেস	০৩	-	-	৩৭৬১	০.০২
জাতীয় গণতান্ত্রিক দল	০১	-	-	১৮১৮	০.০১
স্বতন্ত্র (৯৬ আসন)	১২০	০৫	১.৭৩	৯৮৯৮৮৪	৫.২৫
মোট	১০৭৮	২৮৯	১০০.০০	১৮৮৪৬৮০৮	১০০.০০

উৎসঃ Shamsul Huda Harun (1986), *Bangladesh Voting Behaviour, A Psephological Study 1973*, Dhaka: Dhaka University, p. 251.

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ আনে।[২] বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত এই অভিযোগ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি কারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। নির্বাচনে অন্যান্য দলগুলি আওয়ামী লীগের বিপরীতে বিরোধী দল হিসেবে একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রণীত নতুন সংবিধানটি এবং নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার গণবৈধতা অর্জন করে। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে

Dhaka University Institutional Repository

সফল করতে হলে সংবিধানের প্রতি অনুগত ও শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা অপরিহার্য। কিন্তু প্রথম জাতীয় সংসদে সংখ্যাধিক্যের কারণে বিরোধী দলের অবস্থান ছিল অত্যন্ত দূর্বল ও ক্ষীণ। এ কারণে বিরোধী দল official opposition এর স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। প্রথম সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি ভারসাম্যপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। সরকারি দল আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের কারণে সংসদে বিরোধী দলের পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, "In the absence of any viable opposition, the onerous responsibility of giving the parliamentary democracy an institutional shape in the light of the constitution rested squarely on the ruling party. One possible way to do this was to allow the government backbenchers to play a more activist role".[৩]

প্রথম সংসদের আটটি অধিবেশনে ১৪টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করা হয়। তবে এর কোনটিই আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়নি। জনগুরুত্ব সম্পর্কে স্বল্পকালীন আলোচনার (বিধি ৬৮) ব্যাপারে ১৫টি নোটিশের মধ্যে দু'টি আলোচিত হয়। সাংসদগণ জনগুরুত্ব সম্পর্কে ২২৯টি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব (বিধি ৭১) উত্থাপন করেন যার মধ্যে ৫২টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। অর্ধ ঘন্টা আলোচনায় ৪টি নোটিশের কোনটির ওপরই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথম সংসদে প্রণীত আইনের অধিকাংশই আসে অধ্যাদেশ অনুমোদনের মাধ্যমে। এভাবে কমিটি ব্যবস্থায় ক্রিয়াশীলতা ও সুষ্ঠুতা দৃশ্যমান হয়নি।[৪] সংসদে বিরোধী দলের আধিপত্য না থাকার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে সরকারি দলের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রবাহে সংসদের ভিতরে ও বাইরে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠে। এ সময়ে বামপন্থী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই (ন্যাপ ভাসানী, জাসদ, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী, লেনিনবাদী) সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি বিরোধী দলসমূহের সশস্ত্র তৎপরতায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে।[৫] এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্ষমতাসীন সরকার জাতীয় সংসদে বিশেষ ক্ষমতা আইন (Special Power Act) পাশ করে। ১৯৭৪ সালের ২২ ডিসেম্বর সরকার দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালের ৩ জানুয়ারি জরুরী ক্ষমতা বিধি জারী করে সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করা হয়। একই সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানের উপর চতুর্থ সংশোধনী (Act No. II, 1975) পাশ করা হয়। এর ফলে সরকারের চরিত্রে সূচিত হয় এক মৌলিক ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন (Systematic Change)। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তন করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা।[৬]

জেনারেল জিয়ার সামরিক শাসন এবং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরপরই সেনাবাহিনীতে পরপর কয়েকটি অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। এই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল জিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এই সময়ে জেনারেল জিয়া সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দমন ও অপসারণের মাধ্যমে তার ক্ষমতাকে সুসংহত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, শক্তিশালী জনসমর্থন না থাকলে বিরোধীদের মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্যে জেনারেল জিয়া তার শাসনকে সুদৃঢ় এবং বৈধ করার জন্য সেনা শাসিত উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিল স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং গণভোট।[৭]

গণভোট

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সামরিক শাসকগণ ক্ষমতা গ্রহণের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে গণভোটের আয়োজন করে থাকে। এক্ষেত্রে গণভোটের অর্থ হচ্ছে যে, সেনা নিয়ন্ত্রিত শাসন ক্ষমতায় জনগণের সমর্থন রয়েছে। জিয়াউর রহমান এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে ১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোটের আয়োজন করেন। সরকারি হিসাবে গণভোটে ৮৫% ভোটার উপস্থিত হন। প্রদত্ত ভোটের ৯৮.৮৮% ভোট পেয়ে জিয়াউর রহমান বিজয়ী হন। গণভোটে বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ১.১২%।[৮] গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করতে সমর্থ হন। এ সময়ে তিনি মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দলগুলির সমর্থন লাভ করেন। চীনপন্থী বাম দলগুলি ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জিয়াকে সমর্থন করে। গণভোটের মাধ্যমে জিয়ার বিপুল ভোট প্রাপ্তির পেছনে কিছু কারণ বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হলেও এই গণভোটের বিরুদ্ধে প্রচারণার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। গণভোটকে লক্ষ্য করে জিয়া সরকারি আমলা ও প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করেন। দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী সামাজিক শক্তিগুলো জিয়াকে সক্রিয় সহযোগিতা করলেও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে এ সময়ে শক্তিশালী কোনো বিরোধী দলের উপস্থিতি ছিল না।[৯] এছাড়া পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আওয়ামী লীগ গণভোটের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা পালন করতে না পারলেও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রত্যক্ষভাবে গণভোটের বিরোধীতা করে।

দলের কারাবন্দী কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুপস্থিতিতে ছাত্র ও যুব কর্মীরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচার কার্যে গণভোটকে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী হিসেবে অভিহিত করে। জাসদের ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণভোটের বিরুদ্ধে মিছিল করে।[১০] গণভোটের মাধ্যমে জেনারেল জিয়া তার সেনা শাসনকে প্রাথমিকভাবে বৈধতার রূপ দিতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেও গণভোটের বিরুদ্ধে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাব, ভোট জালিয়াতি এবং অবিশ্বাস্য ভোটার উপস্থিতির কারণে গণভোট প্রক্রিয়াটি তেমন সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

জেনারেল জিয়াউর রহমান তার সামরিক শাসনকে বৈধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঘোষণা দেন।[১১] এই উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ১৯৭৮ সালের ১ মে রাজনৈতিক দলবিধি আনুষ্ঠানিকভাবে উঠিয়ে দিয়ে দলগুলিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।[১২] রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য জিয়া জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করেন। ইতিপূর্বে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে জিয়া কর্তৃক গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল বা জাগদল জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে একীভূত হয়ে যায়।[১৩] জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের দলগুলো হলো জাগদল, ন্যাপ (ভাসানী), মুসলিম লীগ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউ.পি.পি.), লেবার পার্টি ও তফসীল জাতি ফেডারেশন। এই ৬টি দলের সমন্বয়ে গঠিত ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে জিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, গণ আজাদী লীগ ও পিপলস লীগের সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই জোটের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণী ওসমানী।[১৪]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দু'টি জোটের নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কে ভ্লাদিমির পুচকভ বলেন, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও দেশে স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের শ্লোগান তুলে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। তিনি ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ শাসন আমলের তীব্র সমালোচনা করেন। জিয়া সেনাবাহিনী ও গণপ্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বির চেয়ে অধিকতর নিপুনভাবে জনগণের নিকট তার আবেদন পৌছে দেন। তিনি জনগণের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নতি ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অপরদিকে জেনারেল ওসমানী তার নির্বাচনী প্রচারণাকালে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন।[১৫] রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নিম্নের সারণিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি – ৪.২

১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল

প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
জিয়াউর রহমান	১,৫৭,৩৩,৮০৭	৭৬.৬৭
এম. এ. জি. ওসমানী	৪৪,৫৫,২০০	২১.৭০
আজিজুল ইসলাম	৪৯,০৬৪	০.২৪
আবুল বাশার	৫১,৯৩৬	০.২৫
আব্দুল হামিদ	২৩,৯৬৪	০.১৭
মাওলানা খবির উদ্দিন	৮,৪২৫	০.০৪
আব্দুস সামাদ	৩৭,২৭৩	০.১৮
গোলাম মুর্শেদ	৩৮,১৯৩	০.১৯
আবু বকর সিদ্দিক	২৫,০৭৭	০.১২
সৈয়দ সিরাজুল হুদা	৩৫,৬১৮	০.১৭

উৎস: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৮।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে দেশ বিদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জিয়ার নির্বাচনী প্রতিপক্ষ জেনারেল ওসমানী ৬ জুনের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সরকারি দলের তরফ থেকে আমাদেরকে নানা হুমকি ও প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট নির্বাচনে সরকারি অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করে। সরকারি কর্মচারীদের নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করা হয়। আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ তুলে। নির্বাচন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছিল যে, ৩ জুনের নির্বাচনের কারচুপি সর্বজন বিদিত। যে পন্থায় সরকারি ফ্রন্ট এই নির্বাচন পরিচালনা করেছে তা দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নজিরবিহীন। সরকারি হিসেবে প্রাপ্ত শতকরা ৫৪ ভাগ ভোটারের কেন্দ্রে উপস্থিতির ঘোষণা নিতান্তই অবিশ্বাস্য ও সত্যের অপলাপ।[১৬] সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সরকার পরিবর্তনের পদ্ধতিকে গ্রহণ করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু না হওয়াতে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে। জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করলেও নির্বাচন সম্পর্কে বিরোধী দল কর্তৃক ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৭৮ সালের ৩ জুন অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর, পূর্বে গঠিত জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) এবং জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন।[১৭] রাজনৈতিক দল গঠনের পর জিয়াউর রহমান তার সেনা শাসনকে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। বিরোধী দলগুলি জিয়ার এই ঘোষণা প্রত্যাখান করে নির্বাচনের পূর্ব শর্ত হিসেবে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তন, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, সেনাবাহিনী থেকে জিয়ার অবসর গ্রহণ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান ইত্যাদি দাবী উত্থাপন করে।[১৮] বিরোধী দলগুলির এই সমস্ত দাবী-দাওয়ার পেছনে যৌক্তিকতা ছিল যে, যেহেতু শাসক দল নির্বাচনে অংশ নেবে সেহেতু সামরিক আইন বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না। এক্ষেত্রে জিয়ার সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের বিষয়টিও অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

সামরিক শাসনে অবৈধভাবে গ্রেপ্তার হওয়া দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবীটি দলগুলির জন্য রাজনৈতিকভাবে একটি নৈতিক ভিত্তি ছিল। বিরোধী দলগুলির অধিকাংশই তাদের দাবীতে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরে।

বিরোধী দলগুলির উল্লেখিত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় পৌছান। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সামরিক শাসনের অধীনে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করে যে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সাথে সার্বভৌম সংসদ বাংলাদেশের জনগণের সামনে একটি নতুন পরিচিতি তুলে ধরবে। এছাড়া উন্নত অর্থনীতি গঠনও নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের সময়-সীমার মধ্যেই সামরিক শাসন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।[১৯] অপরদিকে আওয়ামী লীগের একাংশ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দৃঢ়কণ্ঠে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আনুগত্য প্রদর্শন করে।[২০] ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২১২৫ জন প্রার্থী এবং ৪২২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই নির্বাচনে শতকরা ৫০ ভাগ ভোটার অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনী ফলাফলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০৭টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ পায় ৩৯টি আসন।[২১] নিম্নের সারণিতে নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো:

সারণি – ৪.৩

১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	প্রতিদ্বন্দ্বী আসনের সংখ্যা	ভোটারের সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন
বিএনপি	২৯৮	৭৯,৩৪,২৩৬	৪১.১৬	২০৭
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৪৭,৩৪,২৭৭	২৪.৫৫	৩৯
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	৫,৩৫,৪২৬	২.৭৮	২
এমএল, আইডিএল (রহিম)	২৬৬	৬,৩১,৮৫১	১০.০৮	২০
জাসদ	২৪০	৯,৩১,৮৫১	৪.৮৪	৮
অন্যান্য দল	৪২০	২৫,৪২,৬১৪	৬.৪৯	৮
স্বতন্ত্র	৪২২	১৯,৬৩,৩৪৫	১.০১	১৬
মোট	২,১২৫	১,৯২,৭৩,৬০০	১০০.০০	৩০০

উৎস: Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics,* Dhaka: The University Press Ltd., p. 87.

নির্বাচনে সরকারি দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বিএনপি'র মিত্র মুসলিম লীগের এক নেতাও এই অভিযোগে সামিল হন। আওয়ামী লীগের একাংশের সভাপতি আ: মালেক উকিল এবং জাসদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সরকারি দল ব্যাপক কারচুপি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে একটি রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট গঠনের মাধ্যমে দেশে একনায়কতন্ত্রী ফ্যাসীবাদী শাসন কায়েম করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।[২২]

১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশনে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জিয়া তার সামরিক শাসনকে সাংবিধানিক বৈধতার রূপ দেন। অর্থাৎ ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ও ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিলের মধ্যবর্তী সময়ে আনীত সকল সামরিক আইন ঘোষণা, অধ্যাদেশ, আইন, আদেশ ও বিধি অনুসমর্থিত ও চূড়ান্ত করা হয়। এই সংশোধনী বলে সামরিক শাসনামলের সকল কার্যাদি, সামরিক আইনে ট্রাইবুনালসমূহের বিচারকার্য, শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকলের অব্যাহতি ও অন্যান্য তৎপরতা ইত্যাদি সাধারণ আইনে করা হয়েছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং সংবিধানে তাদের জন্য বৈধতা সুনিশ্চিত করা হয়। এরপর থেকে উপরোক্ত বিষয়ে কোনো আইনে বা আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ রহিত করা

হয়। এরূপ সাংবিধানিক বৈধতার প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলি সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে।[২৩] ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল সংসদে পঞ্চম সংশোধনী পাস হওয়ার পরই জিয়াউর রহমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সংবিধানকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে।[২৪] দ্বিতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সর্ব বৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় সংসদের মোট কর্ম দিবস ছিল ২০৬ দিন। এর মধ্যে ৮ অধিবেশনে ৬৫টি বিল পাসসহ বেশ কিছু সংসদীয় কর্মকাণ্ড চালানো হয়। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে ৭২৯৪টি তারকা চিহ্নিত, ৮৩৫টি তারকা বিহীন এবং ৩৫টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এছাড়া ৫২টি মূলতবি প্রস্তাব, ১৩৩টি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, ১৩টি জনগুরুত্ব সম্পর্কে প্রস্তাব এবং ৬টি অর্ধ ঘণ্টা আলোচনার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়।[২৫] উল্লিখিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জিয়াউর রহমান তার সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে গণভোট, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করলেও তা সর্বজন কর্তৃক বৈধতা অর্জন করেনি। কারণ জিয়া নির্বাচনে সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যাপক ভোট জালিয়াতির সংস্কৃতি বিনির্মাণ করে। এক্ষেত্রে জিয়া কর্তৃক গঠিত রাজনৈতিক দল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সঙ্গে সার্বভৌম সংসদ তত্ত্বের অকার্যকর মেলবন্ধন ঘটান। সার্বভৌম সংসদ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে নিজস্ব কর্তৃত্বকে সুসংহত রাখে। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীবর্গ সংসদের নিকট দায়ী নন এবং জবাবদিহি করেন না। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর থাকলে সংসদ স্বাধীনভাবে ক্ষমতা চর্চা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। কিন্তু জিয়ার শাসনামলের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃতিতে সার্বভৌম সংসদ তত্ত্বটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তার শাসনকে বৈধতা প্রদান করলেও বিরোধী দলগুলি তা প্রত্যাখ্যান করে। রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত ক্ষমতা, সংসদের কর্তৃত্ব হ্রাস এবং সর্বোপরি সংসদীয় সার্বভৌমত্বের অনুপস্থিতিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দল গঠন

জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন প্রক্রিয়া, তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিষয়টি উদঘাটনের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমান কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর উন্মেষ এর কার্যকারণ বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা রয়েছে। রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্দেশ্যে জিয়া ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঘোষণা দেন যে, একটি অবাধ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে তিনি একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠন করবেন।[২৬] এই ঘোষণার পরপরই রুশ-ভারত বিরোধী শক্তি, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এবং প্রগতিশীল রাজনীতির দাবীদার পিকিংপন্থী উগ্র বাম শক্তিসমূহ একত্রিত হয়ে জিয়াউর রহমানকে রাজনৈতিক দল গঠন করতে সহযোগিতা করে। এই প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমানের সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহে ১৯৭৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠিত হয়। জিয়াউর রহমান জাগদলের সদস্যপদ গ্রহণ না করলেও দলের নেপথ্যে কর্তৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল গঠিত হয় ক্ষমতাসীন শাসকের নিজস্ব উদ্যোগে।[২৭]

১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী ঐক্য ফন্টকে একীভুত করে জিয়াউর রহমান চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দল গঠনের এই পরিকল্পনায় ঐক্য ফ্রন্টের শরিক ইউপিপির একটি অংশ জিয়ার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। এরা হলেন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী এবং আকবর হোসেন।[২৮] অপরদিকে বামদলীয় পিকিং পন্থী ভাসানী ন্যাপের অধিকাংশ নেতাকর্মী দলের বিভক্তি ঘটিয়ে মশিউর রহমানের নেতৃত্বে জিয়ার প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২৯] এছাড়া জাতীয়তাবাদী ঐক্য ফ্রন্টের শরিক দল তফসিলী ফেডারেশন, শাহ্ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একাংশ জিয়ার নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। ঐক্য ফ্রন্টের লেবার পার্টির একটি অংশও জিয়ার নতুন দলে যোগ দেয়।[৩০] উল্লেখিত দলসমূহের সঙ্গে জাগদলের একীভূত হওয়ার মধ্যে দিয়ে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর সরকারের বিদ্যমান মন্ত্রীদের সমন্বয়ে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং জিয়াউর রহমান নিজ দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৩১]

জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারত-সোভিয়েতপন্থী শক্তিসমূহকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল স্বাধীনতাবিরোধী ও প্রগতিশীল রাজনীতির ধারক পিকিংপন্থী উগ্রবাম শক্তিসমূহের সম্মেলন ঘটান। রাজনীতির এই নয়া মেরুকরণে বাংলাদেশের মতাদর্শভিত্তিক রাজনীতি দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সমুন্নত রেখে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ধারক-বাহক, আওয়ামী লীগ, যা রুশ-ভারতপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত হয়। এই ধারায় আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল ন্যাপ (মোজাফ্ফর) কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাসদ। অপরদিকে স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী এবং কতিপয় পিকিংপন্থী বাম দল, যারা পরিচিতি লাভ করে চীন-মার্কিন পন্থী শক্তি হিসেবে। জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত বিএনপির গঠন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে দলীয় রাজনীতিতে বিভক্তিকরণ ঘটে এবং ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রচলন শুরু হয়। এই সময়ে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির মধ্যে দলীয় মতাদর্শভিত্তিক রাজনীতির দ্বান্দ্বিকতা দেখা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিপরীতমুখী অবস্থানে পতিত হয়। সরকার ও বিরোধী দলের এইরূপ বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের প্রকৃতি বাংলাদেশে ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেছে।

সংবিধানের ৫ম সংশোধনী

সেনা অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। এ সময়ে চীনপন্থী কমিউনিস্ট গোষ্ঠীসমূহ সংবিধান বাতিল করে জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান গ্রহণের দাবী জানায়। দক্ষিণপন্থী ইসলামী রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এই সমস্ত চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ব্যতীত দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বাতিল করে সংসদীয় সরকার পুন:প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিল।

জিয়াউর রহমান সামরিক আদেশ বলে কয়েক দফায় সংবিধানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী জারী করেন। এই সমস্ত সংশোধনীসমূহ ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভ করে যা পঞ্চম সংশোধনী নামে পরিচিত। জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের লক্ষ্যে সামরিক নির্বাহী আদেশ বলে (Second Proclamation Order no. 1, April 23, 1977) সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার পরিবর্তন আনেন এবং পরিবর্তিত সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[৩২] নিম্নে জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হলো।

১৯৭৭ সালের ২৩ এপ্রিল ঘোষিত অধ্যাদেশে সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদ থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচিতি বিষয়ক বাঙালি শব্দটি বিলুপ্ত করে দেন। এক্ষেত্রে তিনি সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিতি করেন।[৩৩] মূল সংবিধানে বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামকে জাতির ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করে নাগরিকদের বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় সকল কাজের ভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়।[৩৪] ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ায় এটিকে ১৯৭২ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া তিনি সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনার আগে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম শব্দটিও সংযোজন করেন।[৩৫]

মূল সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সংযোজিত হলেও সংশোধিত আকারে সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার শব্দগুলি সংযোজন করা হয়। এই মতাদর্শ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জিয়া সহযোগী দলগুলির (বামপন্থী ও ডানপন্থী) মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

এছাড়া জিয়া পঞ্চম সংশোধনীতে আরও কিছু বিধান সংযোজন-সংশোধন করেন। তিনি সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে একটি সংযোজনী নিয়ে আসেন। এতে বলা হয়, "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক সুষমকরণ, সংরক্ষণ এবং জোরদার করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবে।[৩৬] এই সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের ক্ষমতা সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি করে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং দুইজন প্রবীনতম বিচারপতির সমন্বয়ে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল নামে একটি পরিষদ গঠন করার বিধান করা হয়। পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা সংসদের সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়। পূর্বে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত যে কোনো সংশোধনী আইনে পরিণত হত। পঞ্চম সংশোধনীতে বিধান করা হয় যে, প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রীয় আদর্শ (অনুচ্ছেদ-৮) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ৪৮, ৮০ ও ৯২ক) এবং সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ১৪২) সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি ইহা গণভোটে পেশ করবেন এবং কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হলে ইহা কার্যকর হবে।[৩৭]

পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল সিপিবির এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।[৩৮] আওয়ামী লীগ (মালেক) সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল ১৯৭৯ সালের ১২ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর সমালোচনা করে বলেন যে, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুযায়ী এই সংশোধনী করা হয়েছে। এটি সংসদীয় রীতি-নীতি বিরোধী।[৩৯]

জিয়াউর রহমান তার সেনা শাসনকে বৈধকরণ এবং প্রলম্বিত করার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। এর মধ্যে প্রশাসনে বেসামরিকীকরণ ও সংবিধান সংশোধন অন্যতম। রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনে তিনি দেশদ্রোহী স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিবর্গের সাথে হাত মেলান এবং সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ঐক্য ও সংহতির রাজনীতিতে বিভাদের সৃষ্টি করেন। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিলুপ্তি ঘটান এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। এর ফলে ১৯৭২ সালে মূল সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও সাংবিধানিকভাবে তারা পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। এ সম্পর্কে Ali Riaz এর Inconvenient Truths about Bangladesh Politics গ্রন্থে বলা হয়েছে, "The executive orders, issued between 1976 and 1979, removed the ban on forming political parties based on religious ideology and allowed the individuals who collaborated with the Pakistani Army in 1971 to participate in politics".[৪০] পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে রাজনীতিতে পরস্পর বিরোধী মতাদর্শগত বিরোধের সৃষ্টি হয়। এর ফলে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় রাজনীতিতে এইরূপ ক্রান্তিকালে সরকার বিরোধী অবস্থানের কারণে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একরূপ দ্বান্দ্বিকতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জিয়ার শাসনামলে রাজনৈতিক মতাদর্শে যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়, সেই বিভক্তি

ক্রমবিকাশের ধারায় জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিতকারী সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ককে এখনও প্রভাবিত করে চলেছে।

এরশাদের সামরিক শাসন এবং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া

১৯৮১ সালের ৩০ মে বিদ্রোহী সামরিক অফিসার কর্তৃক জিয়া নিহত হন। এর ফলে ১৯৮১ সালে ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি আব্দস সাত্তার জয়লাভ করে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।[৪১] রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর জেনারেল এরশাদ ১৯৮১ সালের ২৮ নভেম্বর সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান থাকা অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে তার সরকারি বাসভবনে সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার সম্পাদকদের ডেকে সংবাদ সম্মেলন করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমতি ছাড়াই এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, দেশের নীতি নির্ধারণ ও দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা জাতীয়ভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট ধারা সংযোজনের দাবী জানান। সেনাবাহিনীর ভূমিকা নির্ধারণ ও ক্ষমতার অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত গুরুতর ও গভীর রাজনৈতিক সামরিক সমস্যা বলে উল্লেখ করেন।[৪২] কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও দেশ পরিচালনার বিষয়টি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই অবাঞ্ছিত। সমরবিদ খ্যাত জেনারেল ভন ক্লজউইচ দেড়শ বছর আগে লিখেছেন, "রাজনীতিকে সামরিক বিষয়াবলীর অধীনস্থ করা হবে যুক্তিহীন। কারণ একমাত্র নীতিই যুদ্ধ সৃষ্টি করে এবং একমাত্র নীতিই হলো মৌলিক মানবিক শক্তির প্রকাশক। যুদ্ধ হচ্ছে এই নীতি কার্যকর করার একটি মাধ্যম মাত্র। এর উল্টোটা কখনোই নয়। সুতরাং সামরিক বিষয়াদিকে রাজনীতির অধীনস্থ করাই হচ্ছে একমাত্র বাঞ্ছনীয়।" মার্কসবাদীরা ব্যতীত অন্য কোনো ধারার রাজনীতিবিদই রাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সংঘাত এবং সশস্ত্র শক্তির ভূমিকা অনুমোদন করেন না। চীনা বিপ্লবের মৌলিক বেসামরিক রণকৌশলকে মাও সেতুং তার সেই বিখ্যাত উক্তি 'রাজনীতি সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক' এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মাও সেতুং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের নীতি হচ্ছে পার্টি বন্দুককে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বন্দুক পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না।[৪৩]

জেনারেল এরশাদের সেনাবাহিনী কর্তৃক দেশ পরিচালনায় অংশীদারিত্বের এমন উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা প্রকাশের পরপরই ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন। দেশব্যাপী জারী করেন সামরিক আইন।

মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদকে বাতিল করে সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত করেন।[৪৪] ক্ষমতা গ্রহণের পর এরশাদ ঘোষণা করেন যে, তার কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। তিনি একজন সৈনিক, রাজনীতিবিদ নন এবং একজন সৈনিক হিসেবে তিনি জনগণের সেবা করতে চান।[৪৫] তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর সাধারণত

এই ধরনের ঘোষণা প্রচার করা হয়। এরশাদও এর ব্যতিক্রম নন। জেনারেল এরশাদ তার সেনা শাসনকে বেসামরিকীকরণের উদ্দেশ্যে তার পূর্বসুরী জিয়ার ন্যায় গণভোট, উপজেলা নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন করেন। এরশাদ নিজের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর দাড় করানোর লক্ষ্যে প্রথমেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর ফলে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালের জানুয়ারিতে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ এই সমস্ত নির্বাচনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সমর্থন আদায়ের একটি কৌশল অবলম্বন করেন।

গণভোট ও উপজেলা নির্বাচন

জনগণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সমর্থনের প্রত্যাশায় এরশাদ গণভোট ও উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করা হয়। সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল এই গণভোট বর্জন করে। গণভোটে অংশগ্রহণ ছিল নেতিবাচক। লন্ডন টাইমস তার ২৩ মার্চ ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে গণভোটকে জুয়াচুরি বলে অভিহিত করে।[৪৬] Far Eastern Economic Review গণভোটকে 'bad joke' হিসেবে অভিহিত করে।[৪৭] সরকারি হিসাব মতে ৭২% ভোটার গণভোটে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে জেনারেল এরশাদ ৯৪% হ্যাঁ-সূচক ভোট পান।[৪৮] আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম BBC (British Broadcasting Corporation) এবং VOA (Voices of America) নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানায় যে, ৫% ভাগ থেকে ১৫% ভাগ ভোটার গণভোটে অংশ নিয়েছে।[৪৯]

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি গণভোটকে প্রত্যাখান করায় গণভোটে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। সুতরাং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণভোট গ্রহণযোগ্যতা হারায়। বেসামরিকীকরণের অদম্য প্রচেষ্টায় এরশাদ ১৯৮৫ সালের মে মাসে ৪৬০ উপজেলা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।[৫০] বিরোধী দলগুলো এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে বিরত থাকে। সরকারিভাবে এটি একটি দল নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও কার্যত নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানরা সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরশাদ তৃণমূল পর্যায়ে সমর্থন ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টায় উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এক্ষেত্রে সাহায্যদাতা গোষ্ঠীগুলোও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে প্রস্তাব রাখে। কিন্তু এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে বিরোধী দলগুলি উপজেলা পদ্ধতি প্রত্যাখান করে এবং জনগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়।

দলীয় রাজনীতি

সামরিক শাসনবিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে এরশাদ নিজস্ব বলয়ের একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এ লক্ষ্যকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনি জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির ন্যায় উন্নয়ন ও রাজনীতির সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা

করেন। কর্মসূচিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

১৮ দফা কর্মসূচির ইশতেহারটি জনগণের নিকট পৌছে দিতে এরশাদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ, নতুন বাংলা যুব সংহতি এবং নতুন বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন গড়ে তোলেন।[৫১] জেনারেল এরশাদ তার সমর্থন ভিত্তিকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিভক্ত করতে সক্ষম হন। এরূপ রাজনৈতিক বিভাজন ইতিপূর্বে জিয়ার শাসনামলে শুরু হয়। ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর এরশাদ দলছুট, ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে জনদল গঠন করেন। নতুন দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয় রাষ্ট্রপতি আহ্সান উদ্দিন চৌধুরীকে। জেনারেল জিয়ার জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এর অনুসরণে গঠন করেন জাতীয় ফ্রন্ট। জনদল, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একাংশ, কাজী জাফরের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপল্স পার্টি এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয় ফ্রন্ট।[৫২]

১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট গঠিত জাতীয় ফ্রন্টে আরো যোগ দেয় বিএনপি'র শাহ আজিজ (শাহ) গ্রুপ, বিএনপি'র সিনিয়র নেতা আব্দুল হালিম চৌধুরী, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মত বিএনপি'র অসংখ্য নেতাকর্মী এবং দলবিহীন বিশেষ ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু।[৫৩] অবশেষে এরশাদ ফ্রন্টভুক্ত দলগুলিকে নিয়ে ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টি গঠন করেন।[৫৪] জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনের বৈধতাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক দল গঠন। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য রাজনৈতিক দলে বিভাজন এবং রাজনীতিতে সন্দেহ প্রবণতা, বিশ্বাস ও আস্থার অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনৈতিক প্রবাহে এই অপরাজনীতির সংস্কৃতি সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ককে ক্রমাগত প্রভাবিত করে চলেছে।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

রাজনৈতিক দল গঠনের পরই এরশাদ ১৯৮৬ সালের ২ মার্চ ঘোষণা করেন যে, ২৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[৫৫] ইতিপূর্বে ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিরোধী রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ১ অক্টোবর হতে তৃতীয় বারের মতো ঘরোয়া রাজনীতি ও ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি হতে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়া হয়।[৫৬] এ ধরনের রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বিরোধী দলগুলি ১৯৮২ সালে সংগঠিত অভ্যুত্থানের পর থেকেই এরশাদের পদত্যাগ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠনের দাবী জানাতে থাকে।[৫৭] কারণ বিরোধী দলগুলি জেনারেল জিয়ার সামরিক শাসনামলের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষ করেছে যে, সেনা নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনী ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। এক্ষেত্রে জেনারেল এরশাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া ও একই সূত্রে গাথা। সুতরাং এরশাদের পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক দলগুলি এ ধরনের যৌক্তিক

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান থেকে নির্বাচন বর্জনের হুমকি দেয়। অবশেষে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, জাসদ, মুসলিম লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে।[৫৮] আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে। ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি সাধারণ আসনে ১,৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১,০৭৯ জন। নির্বাচনে ৪৪৮ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশগ্রহণ করে।[৫৯]

নির্বাচনী ফলাফলে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ ৭৬টি আসন লাভ করে সংসদের বৃহত্তর বিরোধী দল হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী ১০টি আসনে জয়ী হয়।[৬০] নিম্নের সারণিতে ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো:

সারণি ৪.৪

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪
আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৫
বিএনপি	১০	৫	১.২৯
কমিউনিস্ট পার্টি	৯	৫	০.৯১
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭
ওয়াকার্স পার্টি	৪	৩	০.৫৩
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	১০	২	০.৭১
গণ আজাদী লীগ	১	-	০.০৮৮
৮ দলীয় জোট	৩১০	৯৭	৩১.২১
জামায়াত-ই-ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬০
জাসদ (রব)	১৩৮	৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	১.৪৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৬০০	৩২	১৭.৮৬
মোট	১৫২৭	৩০০	১০০

উৎস: রশীদ, হারুন-অর (২০১৩), বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৭ মে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস এবং ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠে। আওয়ামী লীগ নেতারা এই নির্বাচনকে "ব্যালট ডাকাতি" বলে অভিহিত করেন।[৬১] তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারচুপি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম যুক্তরাজ্যের BBC (British Broadcasting Corporation), The Guardian, The Times, The Financial Times এবং আমেরিকার VOA (Voice of America) সহ কিছু বিদেশী পর্যবেক্ষক তাদের প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম বহির্ভূত অসৎ আচরণের বিষয় তুলে ধরেন। প্রতিটি গণমাধ্যমই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, অবৈধ ভোট প্রদান ও ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের কথা বলে।[৬২] এ নির্বাচন সম্পর্কে বৃটিশ পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য হচ্ছে "A tragedy for democracy".[৬৩]

নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ১০-১২ জুলাই। ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ এ অধিবেশনে যোগ দেননি। তারা সামরিক আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত সংসদে যাবে না বলে ঘোষণা দেয়। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে এরশাদ শাসনামলের সকল কর্মকাণ্ড অনুমোদন করে সপ্তম সংশোধনী বিল সংসদে গৃহীত হয়। এই বৈধকরণ বিলের পক্ষে ১৫ জন বিরোধী দলীয় সদস্য ভোট দেন। এরা হলেন, মুসলিম লীগের ৪ জন, জাসদ (রব) ৪ জন, জাসদ (সিরাজ) ৩ জন, বাকশালের (৮ দলীয়ভুক্ত) ২ জন এবং নির্দলীয় ২ জন। অপরদিকে ৮ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ওয়াকার্স পার্টি ও ন্যাপের উভয় অংশ এবং জামায়াতে ইসলামীর সদস্যগণ সংসদ অধিবেশন বর্জন করে। সংসদে সামরিক শাসনের কর্মকাণ্ড বৈধকরণ বিল পাশ হবার পরই এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।[৬৪]

তৃতীয় জাতীয় সংসদের মেয়াদ ১৩ জুলাই ১৯৮৭ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময়কালে ৪টি অধিবেশনের ৭৫টি কর্মদিবসে ৩৮টি আইন পাশ হয়। এই সংসদে ২৭৯৬টি তারকাচিহ্নিত, ৫৭৫টি তারকাবিহীন এবং ৮টি স্বল্পকালীন প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তর প্রদান করা হয়। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ২০৯টি মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যার মধ্যে ৫টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। তৃতীয় সংসদে ৬৮০টি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে ১২৪টি ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিভিলেজ প্রশ্নে ৮৫টি প্রস্তাব আসে এবং এর মধ্যে ২০টি আলোচিত হয়। অর্ধঘন্টা আলোচনার জন্য ১৬টি প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র একটি গৃহীত হলেও তা বাতিল হয়ে যায়।[৬৫]

এরশাদ তার সেনা শাসনকে বৈধতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং সমঝোতার মাধ্যমে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আনুগত্য লাভ করেন। এরশাদের বেসামরিকীকরণের প্রহসনমূলক অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিরোধী দলগুলি মেনে নেয়নি। জিয়ার বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার ন্যায় এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়াও বিরোধী দল প্রত্যাখান করে। এর ফলে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাতপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে এরশাদের শাসনামলের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ কার্যকারিতা হারায়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

সংসদ নির্বাচনের পর সংসদের কোনো অধিবেশন আহ্বান করার আগেই এরশাদ সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন।[৬৬] এই প্রেক্ষাপটে এরশাদ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে থাকা অবস্থায়, ১৯৮৬ সালের ৩১ আগস্ট জাতীয় পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করে, দলীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৬৭] এরপর তিনি ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঘোষণা করেন। সকল রাজনৈতিক জোট ও দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে প্রত্যাখান করে। ৮ দলীয়, ৭ দলীয় এবং ৫ দলীয় ঐক্যজোট, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী দল এই নির্বাচনকে শুধু প্রত্যাখানই করেনি উপরন্তু নির্বাচন প্রতিরোধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। বিরোধী দলগুলি নির্বাচনের দিন হরতাল ডেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে।[৬৮]

নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫৪.২৩% ভোটার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট প্রদান করে। এরশাদ প্রায় ৮৩.৫৭% ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এরশাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি মোহাম্মদ উল্ল্যা এবং ফারুক রহমান যথাক্রমে ৫.৬৯% এবং ৪.৫১% ভোট পায়। বিরোধী দলগুলি নির্বাচনে শতকরা ৩ ভাগেরও কম ভোটার ভোট প্রদান করেছে বলে মন্তব্য করে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনে ১৫% ভাগ ভোট গ্রহণের কথা বলেন।[৬৯] সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের রূপ দিতে গিয়ে এরশাদ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তার শাসনকে বৈধকরণের উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে নীতিবিবর্জিত পর্যায়ে পরিণত করেন। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং নির্বাচনকে একটি প্রহসনে পরিণত করেন। এই নির্বাচনী প্রহসনই পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহে একটি অগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হিসেবে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নব্বইয়ের গণআন্দোলন

রাজনীতিতে জনবিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধে বিরোধী দলগুলি এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে একটি সর্বদলীয় অবস্থান গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হয়। ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি প্রধান প্রধান জোট মিলে একটি অভিন্ন চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সংসদকে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ রাজপথেও সমানভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। ১৯৮৭ সালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অগ্রসর হলে সরকার ১৯৮৭ সালের ২৭ নভেম্বর দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে।[৭০] এরশাদ তার ক্ষমতাকে সুসংহত করার প্রচেষ্টায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার এক পর্যায়ে, সংবিধান সংশোধন করে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার গঠনেও সম্মত হন। কিন্তু ক্ষমতার সহযোগী সামরিক উপদেষ্টাদের দ্রুত হস্তক্ষেপে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। এই উদ্যোগ ব্যর্থ হবার পরপরই জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য নির্দলীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এ সময়ে শেখ হাসিনা গৃহে অন্তরীণ থাকার

ফলে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যরা একটি বৈঠকে সকল সংসদ সদস্যের পদত্যাগের পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করেন।[৭১]

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ তড়িঘড়ি করে ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তৃতীয় জাতীয় সংসদ বাতিল করেন এবং ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।[৭২] ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলি নির্বাচন বর্জন করে। ৭২টি রাজনৈতিক দল সম্মিলিত বিরোধী জোট গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচন কমিশনের দাবী অনুযায়ী ৫২.৪৮ শতাংশ ভোটার নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। অপরদিকে নির্বাচন বর্জনকারী বিরোধী দলগুলির অভিমত নির্বাচনে ১ শতাংশের বেশী ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেনি।[৭৩] ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৫১টি আসনে জয়লাভ করে। এরশাদ সরকারের অনুগত বিরোধী দলীয় জোট পায় ১৯টি আসন, জাসদ (সিরাজ) ৩টি, ফ্রিডম পার্টি ২টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ পায় ২৫টি আসন।[৭৪] নিম্নের সারণিতে ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো:

সারণি – ৪.৫

১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দল/স্বতন্ত্র	আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	২৫১	৮৩.৬৬	১,৭৬,৪০,১৩৩	৬৪.৪৪
সম্মিলিত বিরোধী দল	১৯	৬.৩৩	৩২,৬৩,৩৪০	১২.৬৩
জাসদ (সিরাজ)	৩	১.০০	৩,০৯,৬১৬	১.২০
ফ্রিডম পার্টি	২	০.৬৬	৮,৫০,২৮৪	৩.১৯
অন্যান্য দল	-	-	২,৪২,৫৬১	০.৯৪
স্বতন্ত্র	২৫	৮.৩৩	৩৪,৮৭,৪৫৭	১৩.৪৫

* ২৫১টি আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টির ১৮ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়।

উৎস: Hakim, Muhammad A. (1993), *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka: UPL, pp. 30-31.

নির্বাচনে সরকার সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ ওঠে। তাদের এ অনিয়মের সহায়তাকারী হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যোগসাজস রয়েছে বলে পর্যবেক্ষক মহলের অভিমত। বিরোধী দলগুলি ভোটার বিহীন নির্বাচনী ফলাফল বর্জন করে এবং তা বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবী জানায়।[৭৫] জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনামলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে

নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জন্ম নেয় অবিশ্বাস এবং আস্থাহীনতার।

১৯৮৮ সালের ৭ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৭৬] ইতিপূর্বে জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজের ভিত্তি হিসেবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হয়। এরশাদের অষ্টম সংশোধনী শুধু ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে স্বীকৃতি ও পুনর্বাসিতও করেছে। সার্বভৌম সংসদে ধর্মকে রাজনীতিকরণের বিল পাসে সহায়তাকারী ছিল এরশাদের তথাকথিত অনুগত বিরোধী দল। এ সমস্ত বিরোধী দল সম্পর্কে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য হচ্ছে, "Loyal opposition",[৭৭] এ ধরনের বিরোধী দলকে অনেকেই আবার "home-made opposition" বলেও আখ্যায়িত করেন। এরশাদ শাসনামলে শক্তিশালী দায়িত্বশীল বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আজ্ঞাবহ সংসদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, "Former President Ershad's two Parliament's of 1986 and 1988, were the apogee of 'Rubber Stamp' Parliament".[৭৮]

চতুর্থ জাতীয় সংসদ ১৬৮টি কর্মদিবসে সর্বমোট ৭টি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং ১৪২টি আইন পাস করে। এ সংসদে ৫৮১২টি তারকাযুক্ত, ৯৩১টি তারকাবিহীন এবং ৯টি স্বল্পকালীন প্রশ্ন গৃহীত হয় ও উত্তর প্রদান করা হয়। ৩৩৭টি মুলতবি প্রস্তাবের মধ্যে ৫টির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দৃষ্টি আকর্ষণী-সংক্রান্ত ১৪৫৯টি নোটিশের ১৫১টি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয় এবং জনগুরুত্ব সম্পর্কে স্বল্পকালীন আলোচনার ২৩৮টি নোটিশের মধ্যে ৫১টির ওপর আলোচনা হয়। অর্ধঘণ্টা আলোচনার ক্ষেত্রে ৫৬টি নোটিশ পাওয়া যায় এবং এর ৯টির ওপর আলোচনা চলে। প্রিভিলেজ প্রশ্নে ৬৬টি নোটিশের ১০টি গ্রহণ করা হয়।[৭৯] চতুর্থ সংসদে নির্বাহী আদেশ অনুমোদন অব্যাহত ছিল। সংসদের স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন থাকার ফলে নির্বাহীর স্বার্থবিরোধী বা প্রধান জাতীয় ইস্যু নিয়ে বিতর্ক বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ ও জনসমর্থিত না হওয়ায় বৈধতার সংকট সৃষ্টি হলে সংসদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।[৮০]

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এরশাদের সামরিক শাসনবিরোধী রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাদের সরব উপস্থিতি ঘোষণা করে। নাগরিক কমিটি, উন্মুক্ত ফোরাম, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ আরো বেশ কিছু সংগঠন স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাতে সম্মিলিত আন্দোলনের আহ্বান জানায়। এ সময় পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সক্রিয় সমর্থনে ডাকসুর নেতৃত্বে সবগুলো প্রধান ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়। ছাত্র এবং পেশাজীবীদের

সমন্বিত উদ্যোগটি প্রধান দু'টি রাজনৈতিক জোটকে সরকার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অবশেষে শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে এক দফা দাবী নিয়ে এগিয়ে যায়। সেটি হলো নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মুক্ত ও অবাধ একটি নির্বাচন।[৮১]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর তিনটি জোট (১৫, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট) ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটি যৌথ ঘোষণা প্রণয়ন করে।[৮২] রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ একটি সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে এরশাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তিন জোটের মনোনীত প্রার্থী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। স্বৈরাচার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় মতাদর্শে বিভাজন থাকলেও জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি রক্ষায় দলগুলো এক কাতারে সামিল হয়।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যমত গঠনে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে বুদ্ধিজীবীগণ তাদের ভূমিকা যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ যেমন করেছেন, তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে রাজনৈতিক পদক্ষেপ সম্পর্কেও দিক নির্দেশ করেছেন।[৮৩] ১৯৯০ এর শেষার্ধে পেশাজীবী সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণের মাত্রা ছিল অধিকতর। এক্ষেত্রে সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগঠনটি সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে সকল বিভ্রান্তির উর্দ্ধে উঠে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সুদৃঢ় ঐক্য কামনা করেছে এবং পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করার জন্য একটি জাতীয় কনভেনশন ডাকতে সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে পেশাজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনকে অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করতে নতুন মাত্রা যোগ করে।[৮৪] অনুরূপভাবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ভূমিকা উল্লেখ করে বলা যায় যে, সাংস্কৃতিক ও নাট্যকর্মীরা এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলনের স্বার্থে সর্বস্তরের জনগণকে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক দায়িত্বও পালন করেছেন।[৮৫]

এরশাদ পতন আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলো কর্তৃক গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্রদের অংশগ্রহণ দলীয় সংকীর্ণতাকে এড়িয়ে ব্যাপক হয়ে উঠে। ছাত্রদের উদ্যোগে যে আন্তরিকতা, সততা ও দৃঢ়তা প্রতিফলিত হয় তাতে এরশাদের দু:শাসনে অতিষ্ঠ জনগণ আন্দোলনের একটি 'প্লাটফরম' খুজে পায়।[৮৬] স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে অংশ নেওয়া জনসংগঠনগুলো সুসংবদ্ধভাবে সমন্বিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হলেও 'গণসংযোগ' স্থাপন ও 'গণসচেতনতা' সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ গণআন্দোলন ছিল মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক। এ

কারণে ঢাকা কেন্দ্রিকতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংকীর্ণ পরিসরকে নির্দেশ করে। বিশ্লেষকদের মতে, এরশাদ আমলে বিগত বছরগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মকাণ্ডের সংকীর্ণ পরিসর ছেড়ে অন্যান্য অঞ্চলের বৃহত্তর জনগণকে এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস পায় নাই। এর ফলে শেষ নাগাদ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ যত না ছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতে তার চেয়ে বেশি ছিল ছাত্র জনতার হাতে।[৮৭]

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জনগণের অধিকার ও দাবী সম্পর্কে যথেষ্ট পরিস্কার ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য না রেখেই দাবী আদায়ের সংগ্রামে বা এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। জনগণকে গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট এবং পুথিগত ধারণা কেন্দ্রিক বক্তব্য প্রদান করা ছাড়া অধিকার রক্ষার প্রক্রিয়া বা গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্ক বিশেষ অবহিত করা হয় নাই।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে দেশব্যাপী ব্যাপক গণসচেতনতা নির্মাণে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ব্যর্থ হলেও নিজস্ব সংকীর্ণ স্বার্থগত বিষয়ে সব সময়ে সচেতন থেকেছে। ১৯৯০ এর সফল গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হলেও যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সমর্থন বলয়ের ক্ষমতা চর্চা অব্যাহত থাকে। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ এবং তার মন্ত্রীদের বিচার প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রকে অবহিত করতে হয়। এ ধরনের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলি আনুষ্ঠানিক নিন্দা জ্ঞাপন করলেও জনগণের নিকট এই বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেনি। এখানেই রাজনৈতিক দলের আদর্শগত সংকীর্ণতা যা গণপ্রতিনিধিত্বে অনাবশ্যকীয়।[৮৮] দলীয় আদর্শগত সংকীর্ণতাকে অতিক্রমের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাব হওয়া উচিৎ প্রকৃতপক্ষেই জনহিতকর। পরিশেষে বলা যায় যে, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়া জনসংগঠনের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ঐকমত্যের চেতনাকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সরকার ও বিরোধী দল তাদের আন্ত:সম্পর্ক বিনির্মাণে সমুন্নত রাখতে পারে।

উপসংহার

১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হলেও ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রথম জাতীয় সংসদে official opposition না থাকায় সরকার ও বিরোধী দলের দলগত অবস্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ভারসাম্য পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। সেনা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনামলে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অবস্থান থাকলেও সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের আন্ত:সম্পর্ক প্রবলভাবে বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে। উভয় দলের বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা মূলত এখানেই। জিয়াউর রহমান তার সামরিক শাসনকে

বেসামরিকীকরণের রূপ দিতে গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করলেও রাজনৈতিক দলগুলি তা প্রত্যাখান করে। অপরদিকে জেনারেল এরশাদ তার সেনাশাসনকে সাংবিধানিকভাবে বৈধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চতুর্থ জাতীয় সংসদে নির্বাচনের আয়োজন করলেও প্রধান রাজনৈতিক দল তাতে সাড়া দেয় নাই। তাছাড়া এ নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতেও ব্যর্থ হয়। এরশাদ তার রাজনৈতিক সহযোগিদের প্রচেষ্টায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার দাবী করলেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তা প্রত্যাখান করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে। গণআন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে এরশাদের পতন ঘটে। জিয়া ও এরশাদের শাসনামলে স্বৈরশাসন কায়েম হওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি দৈন্যদশায় পতিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় মতাদর্শে জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। স্থান পায় সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাবে রাজনৈতিক দলে বহুমুখী বিভাজন ঘটে। সেনা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নীতি ও আদর্শ বিহীন রাজনৈতিক বিভক্তি রাজনীতিতে আস্থাহীনতার সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় রাজনীতি জনবিচ্ছিন্নতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। চতুর্থ জাতীয় সংসদের বিরোধী দল ক্ষমতাসীন সরকারের অনুগত হওয়ায় বিরোধী দল তার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। এরশাদ শাসনামলের তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল বিরোধপূর্ণ। উক্ত সংসদসমূহে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের প্রকৃতিতে সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ পূর্ণ মেয়াদও অতিক্রম করতে পারেনি। সংসদীয় কার্যক্রমের উপর নির্বাহী কর্তৃত্বের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকায় সংসদ তার কার্যকারিতা হারায়।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Harun, Shamsul Huda (1986), *Bangladesh Voting Behaviour, A Psephological Study 1973,* Dhaka: Dhaka University, pp. 1-4.

২। Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh,* England: Ashgate Publishing Limited, p. 34.

৩। Ibid, p. 35.

৪। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ২৫।

৫। হক, আবুল ফজল (১৯৯০), *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১০৮।

৬। Riaz, Ali (2013), *Inconvenient Truths about Bangladesh Politics,* Dhaka: Prothoma Prokashan, p. 5.

৭। Iftekharuzzaman, Rahman Mahbubur (1991), "Transition to Democracy in Bangladesh: Issues and Outlook", *BIISS Journal,* vol. 12, no. 1, January, pp. 112-113.

৮। *The Bangladesh Times,* June 1, 1977.

৯। Rashiduzzaman M. (1978), "Bangladesh in 1977 Dilemmas of the Military Rulers", *Asian Survey,* vol. xviii, no. 2, February, 1978.

১০। Moniruzzaman, Talukdar (1988), *Bangladesh Revolution and its Aftermath,* Dhaka: University Press Ltd., p. 126.

১১। হক, আবুল ফজল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫।

১২। আহমদ, মওদুদ (২০০০), *গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ৭৬।

১৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

১৪। রশিদ, হারুন-অর (২০১৩), *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ৩৫৫।

১৫। আলম, মোঃ শামছুল (২০০৫), *সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের সংকট: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ, পৃ. ৮৭।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

১৭। রশিদ, হারুন-অর (১৯৮৮), "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর অবস্থান: বাংলাদেশ প্রসঙ্গে", *রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা*, পৃ. ৫৬।

১৮। Khan, Mohammad Mohabbat and Zafarullah, Habib Mohammad (1980), The 1979 Parliamentary Elections in Bangladesh, Ahmed, Emajuddin, ed., *Bangladesh Politics*, Dhaka: Centre for Social Studies, Dhaka University, pp. 120-121.

১৯। Choudhury, Dilara (1995), *Constitutional Development in Bangladesh, Stresses and Strains*, Dhaka: University Press Ltd., p. 100.

২০। Hasanuzzaman, Al Masud (1988), *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: The University Press Limited, p. 85.

২১। *Ibid*, pp. 82-87.

২২। আলম, মোঃ শামছুল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯।

২৩। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬।

২৪। Rahman, Mahbubur (1991), "Democracy in Bangladesh Stresses and Strains on Constitutionalism", *The Journal of Political Science Association*, Proceedings of the Sixth National Conference, p. 106.

২৫। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮-২৯।

২৬। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯।

২৭। Riaz, Ali (1994), *State Class & Military Rule Political Economy of Martial Law in Bangladesh*, Dhaka: Nadi New Press, p. 242.

২৮। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮।

২৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০।

৩০। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

৩১। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

৩২। Riaz, Ali, *op.cit*., p. 7.

৩৩। আহমদ মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।

৩৪। হক, আবুল ফজল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৯।

৩৫। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯।

৩৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬১।

৩৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

৩৮। হক, আবুল ফজল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩১।

৩৯। *দৈনিক সংবাদ*, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৯।

৪০। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ২০ এপ্রিল, ১৯৭৯।

৪১। Riaz, Ali, *op.cit.*, p. 8.

৪২। Islam, M. Nazrul (1995), "Parliamentary Democracy in Bangladesh: An Assessment", *Asian Studies*, vol. ..., no. 14, June, p. 31.

৪৩। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (১৯৯১), *বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকারের সামারিকীকরণ*, ঢাকা: ইউপিএল, পৃ. ৩-৩৭।

৪৪। মনিরুজ্জামান, তালুকদার (১৯৯২), "সামরিক শাসনের ফলাফল", হোসেন, গোলাম, সম্পাদিত, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, পৃ. ২৩৯।

৪৫। আহমদ, এমাজউদ্দিন (১৯৯৩), *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট*, ঢাকা: প্রকাশক শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন, পৃ. ৫৬।

৪৬। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৫।

৪৭। হোসেন, গোলাম, "রাজনীতিতে স্বৈরাতান্ত্রিক পিতৃয়তা: বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের উত্থান-পতন", হোসেন, গোলাম, সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।

৪৮। আলম, মোঃ শামছুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

৪৯। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 114.

৫০। Mannan, Md. Abdul (2005), *Election and Democracy in Bangladesh*, Dhaka: Academic Press and Publishers Library, p. 91.

৫১। হোসেন, গোলাম, সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০১।

৫২। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৬।

৫৩। হক, আবুল ফজল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭।

৫৪। হোসেন, গোলাম, সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০২।

৫৫। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৭-৩০৮।

৫৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১।

৫৭। রশিদ, হারুন-অর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১ (দেখুন, রশিদ, হারুন-অর, "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর অবস্থান: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ", *রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা*, ১৯৮৮)।

৫৮। হক, আবুল ফজল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭।

৫৯। Moniruzzaman, Talukder (1994), *Politics and Security of Bangladesh*, Dhaka: University Press Ltd., p. 84.

৬০। রশিদ, হারুন-অর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৩ (দেখুন, রশিদ, হারুন-অর, *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৩)।

৬১। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, pp. 116-118.

৬২। *Ibid*, p. 118.

৬৩। Maniruzzaman, Talukder, *op.cit*., p. 84.

৬৪। Mannan, Md. Abdul, *op.cit.*, p. 94.

৬৫। *Ibid*, p. 94.

৬৬। রশিদ, হারুন-অর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২।

৬৭। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০।

৬৮। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১১।

৬৯। Mannan, Md. Abdul, *op.cit.*, p. 97.

৭০। *Ibid*, p. 97.

৭১। Hakim, Muhammad A. (1993), *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka: UPL, p. 28.

৭২। জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (১৯৯২), সম্পাদিত, *এরশাদের পতন, বিবিসি সহ বিদেশী গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৪২।

৭৩। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৫-৩১৬।

৭৪। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 126.

৭৫। Hakim, Md. Abdul (2001), *The Changing forms of Government in Bangladesh: The Transition to Parliamentary System in 1991 in Perspective*, Dhaka: Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, p. 54.

৭৬। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 127.

৭৭। Mannan, Md. Abdul, *op.cit.*, pp. 101-103.

৭৮। Riaz, Ali, *op.cit.*, p. 9 (See *Inconvenient Truths about Bangladesh Politics*, Dhaka: Prothoma Prokashan, 2013).

৭৯। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 127.

৮০। Choudhury, Dilara, *op.cit.*, p. 138.

৮১। হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১।

৮২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

৮৩। আহমদ, মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৯-৩২০।

৮৪। হক, আজিজুল (১৯৯২), *বাংলাদেশ: সমাজ রাজনীতি গণতন্ত্র*, ঢাকা: ঢাকা কম্পিউটার্স, পৃ. পরিশিষ্ট।

৮৫। বেগম, খুরশীদা, "অগণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার বিপক্ষে কর্মযোগ ও বাংলাদেশ, ১৯৯০", হোসেন, গোলাম (১৯৯২), সম্পাদিত, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, পৃ. ২২২।

৮৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩-২২৪।

৮৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫-২২৬।

৮৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭।

৮৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০।

৯০। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১-১৯৯৫: সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন এবং সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ভূমিকা

জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের আন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে একই সাথে সহযোগিতামূলক এবং বিরোধিতামূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এ অধ্যায়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদের গঠন, সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন, সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐক্যমত গঠনের স্বরূপ, সংসদের ভিতরে সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ, যথা- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, আর্থিক কার্যক্রম এবং সংসদীয় তদারকিমূলক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পর তিন জোটের মনোনীত উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করেন। নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে তিনি নির্বাচন কমিশন পুন:গঠন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান সম্বলিত নির্বাচন কর্মকর্তা অধ্যাদেশ (বিশেষ বিধান) ১৯৯০ জারী করেন।[১]

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৭৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনে ২৭৮৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[২] নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল জবাবদিহিমূলক সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার করে।[৩] অপরদিকে বিএনপি সরকার পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে নিরবতা পালন করলেও জিয়া প্রবর্তিত বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার প্রতি এ দল আস্থাশীল বলেই প্রতীয়মান হয়।[৪] রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে গণতন্ত্রের জন্য জনগণের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের লক্ষ্য অর্জন ও ধারণে নির্বাচনী ইশতেহার যথাযথ নয়। দলগুলি ইশতেহারে সংকীর্ণগত দলীয় স্বার্থকেই সমুন্নত রেখেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে উৎপাদন-বণ্টন সুযোগ-সুবিধা দান গণউন্নয়ন প্রভৃতি মৌল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো দিক-নির্দেশনা নেই।[৫]

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪০টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ৮৮টি আসনে। জাতীয় পার্টি এরশাদ ৩৫টি এবং জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন পায়।[৬] নিম্নের সারণিতে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ফলাফল দেওয়া হলো।

সারণি – ৫.১

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
বিএনপি	৩০০	১৪০	৩০.৮১
আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
বাকশাল	৬৮	৫	১.৮১
কমিউনিস্ট পার্টি	৪৯	৫	১.১৯
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	৩১	১	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১	০.৪৫
	৪২৮	১০০	৩৪.২৯
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
জামায়াত-ই-ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	১	০.১৯
জাসদ (সিরাজ)	৩১	১	০.২৫
এনডিপি	২০	১	০.৩৬
ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	১	০.৭৯
জাসদ (রব)	১৬১	-	০.৭৯
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১২৫৯	৩	৮.৪৭
মোট	২৭৮৭	৩০০	১০০

উৎস: রশীদ, হারুন-অর (২০১৩), *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ৩৬৮।

পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে শতকরা ৫৫.৩৫ ভাগ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।[৭] নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল মেনে নিলেও নির্বাচন উত্তর বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা নির্বাচনে সুক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ তোলেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের ৪ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল, জাপানের সংসদ ডায়েট এর ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এবং SAARC

(South Asian Association for Regional Co-operation) এর চার দেশীয় প্রতিনিধি দল নির্বাচনের দিন অনেকগুলি নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন করে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে বলে তাদের মতামত প্রকাশ করেন।[৮] ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধী দল ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় তিন জোটের রূপরেখা মোতাবেক সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানায় এবং এ সম্পর্কিত একটি বিল সংসদে উত্থাপন করে। এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে তার পূর্ব পদে ফিরে যাবার বিধান সম্বলিত সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী নামে দু'টি বিল সংসদে উত্থাপন করে। দীর্ঘ আলোচনার পর সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়। একাদশ সংশোধনীর পক্ষে ২৭৮টি এবং দ্বাদশ সংশোধনীর পক্ষে ৩০৭টি ভোট পড়ে। জাতীয় পার্টি ও এনডিপি ভোটদানে বিরত থাকে। দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ২০ বছর পর সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৯]

সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রশ্নে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। বিএনপি কর্তৃক সরকার গঠিত হওয়ার পর পরই বিরোধী দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পক্ষে দাবী জানায়। বিএনপি এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অবশ্য রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে ছিলেন।[১০] আওয়ামী লীগ ইতিপূর্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সংগামের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে জনমত গঠন করে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফিরে যাবার প্রত্যয় ঘোষণা করে। এছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনের ঘোষণা দেয়। পক্ষান্তরে বিএনপি জন্মলগ্ন থেকে ১৯ দফা ভিত্তিক দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থাকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। বিএনপি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এবং ১৯৯১ এর সংসদ নির্বাচনের দলীয় ইশতেহারে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা দেয়। সরকার ও বিরোধী দলের এরূপ বিপরীতমূখী অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন সরকারকে ৯০-এর গণআন্দোলনের তিন জোটের যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতিশ্রুতির প্রতি যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানায়।[১১]

সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার ইসতিয়াক আহমদ বলেন, "There is now a national consensus for parliamentary form of government".[১২] জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেশের ভবিষ্যত সরকার সম্পর্কিত বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক 'সার্বভৌম সংসদ' প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "The confidence the people had on the three alliances and the commitment we made, people are hoping that on the basis of that amendment will come to this parliament and

people's rule will be established, Hon'ble Speaker, we have seen in the past there was one man's rule, autocracy was established through presidential form of government. The people do not want that. The people want parliamentary form of government instead of presidential form of government. The people do not want a rubber-stamp parliament. The people want a sovereign parliament. They want that the government be accountable to the parliament".[১৩]

বিএনপি '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান কেন্দ্রিক তিন জোটের যৌথ ঘোষণা কার্যকর করার নৈতিক বাধ্যবাধকতা মূল্যায়নের জন্য ১৯৯১ সালের ৯ জুন কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করে। সভায় উপস্থিত ২৭ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জনই সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে যাবার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ১০ জুন অনুষ্ঠিত সভায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্য সংসদীয় ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। বেগম খালেদা জিয়া সংসদ সদস্যদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের সাথে একমত পোষণ করেন।[১৪] খালেদা জিয়ার সম্মতির মধ্যে দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে একটি সর্বদলীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এ ধরনের ঐকমত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯৯১ সালের ১৫ এপ্রিল পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন বিলের প্রথম নোটিশ উত্থাপন করে আওয়ামী লীগ। এরপর ১৯৯১ সালের ৩০ জুন অনুষ্ঠিত সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিএনপি সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত দু'টি বিলের নোটিশ সংসদে উত্থাপন করে। একই অধিবেশনে ১৯৯১ সালের ৪ জুলাই বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন সংসদে সংবিধান সংশোধনী সম্পর্কিত আরো ৪টি বিল আনেন। ১৯৯১ সালের ৯ জুলাই সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত ৭টি বিল সংসদের সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্যের একটি বাছাই কমিটিতে প্রেরিত হয়। আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ ছিলেন এই বাছাই কমিটির সভাপতি। বাছাই কমিটির উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিএনপির ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ এবং ওয়াকার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন প্রমুখ। এই বাছাই কমিটি ২৯টি বৈঠকে প্রায় ১০০ ঘণ্টা আলোচনা পর্যালোচনা করে ২৮ জুলাই ১৯৯১ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের রিপোর্ট প্রদান করে।[১৫] বাছাই কমিটির এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি পাশ হবার পর সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোট (Referendum) দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শতকরা ৩৫.১৯ ভাগ ভোটার বিলের উপর তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। প্রাপ্ত ভোটের ৮৪.৩৮ শতাংশ ভোটার সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যাবার পক্ষে মতামত প্রদান করে।[১৬]

পঞ্চম সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সমঝোতা সৃষ্টির পেছনে একটি অন্তর্নিহিত কারণ বিদ্যমান ছিল। ১৯৯০-এর গণআন্দোলনে স্বৈরাচারী শাসনের বিপরীতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে নির্মিত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বাস্তবতার নিরিখে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, এরশাদ শাসনামলে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে কোনো নির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি সংসদের প্রত্যয়ে রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমাগত আন্দোলন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেও বিপরীতমুখী দলীয় নীতি ও আদর্শ কেন্দ্রিকতার কারণে সরকার বিরোধী একটি সর্বদলীয় ঐক্যজোট গঠনে দ্বিধান্বিত ছিল। গণবিরোধী শাসনের প্রকৃত ভুক্তভোগী জনগণ এবং তাদের বিভিন্ন শ্রেণী সংগঠন দার্শনিক প্রজ্ঞায় আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রয়াশ নির্মাণে প্রভাবিত করে। মূলত জনতার সম্মিলিত আহ্বান এবং সেনাবাহিনী ও আন্তর্জাতিক সমর্থনের একটি ভিত্তির উপর দাড়িয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একটি ঐক্যজোট গঠনে সক্ষম হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন দল বিএনপি সরকার ব্যবস্থার প্রশ্নে দলীয় আদর্শগত কারণে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিলেও সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগের শক্তিশালী অবস্থান এবং ৯০-এর গণআন্দোলনের তিন জোটের রূপরেখার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের স্বরূপটি আত্ম-উপলব্ধি করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "Almost all political parties, except the BNP, were committed to the parliamentary system and demanded its reintroduction during the pro-democracy movement and afterwards. Consequently, the BNP, changed its stance, and the fifth parliament elected in 1991 brought in the Twelfth Amendment which was ratified through a referendum".[১৭] সরকার ব্যবস্থার প্রশ্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সরকারি দল বিএনপি ও বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ক্ষণিকের জন্য জাতীয় ঐকমত্যে উপনীত হলেও সংসদ স্থায়ীত্বকালের অবশিষ্ট সময়ে সরকার ও বিরোধী দল জাতীয় জনগরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়েই একমত পোষণ করতে পারেনি।

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্ক

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ কেন্দ্রিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করা হলো।

সরকারি ও বেসরকারি বিল

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সর্বমোট ২২টি অধিবেশনে ২৭৮টি সরকারি বিলের নোটিশ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৮৪টি বিল উত্থাপিত হয় এবং ১৭২টি বিল গৃহীত হয়। গৃহীত ১৭২টি বিলের মধ্যে ১০২টি সরকারি বিল এবং ৭১টি অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশগুলো ইতোপূর্বে আইন হিসেবে বলবৎ হয় এবং যা পরবর্তীতে শুধুমাত্র

অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। জাতীয় সংসদে উত্থাপিত সরকারি বিলের উপর বিরোধী দলের আলোচনার সুযোগ সীমিত। উল্লেখ্য যে, পঞ্চম সংসদে ১৮৪টি সরকারি বিলের উপর আলোচনা কালে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক ১০৩টি বিলের উপর বিভিন্ন আকারে জনমত যাচাই বাছাই কমিটি, স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ ও বিভিন্ন ক্লজের উপর সংশোধনী সহ ৮৫৯টি প্রস্তাব প্রদান করেন। তন্মধ্যে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব ছিল ৪০২টি, যার মধ্যে কম ভোটে নাকচ হয় ৪০১টি এবং গৃহীত হয় ১টি প্রস্তাব। বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব আনা হয় ৭৯টি, কিন্তু সবকয়টি নাকচ হয়ে যায়। স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের জন্য প্রস্তাব আনা হয় ১৮টি কিন্তু কম ভোটে সব কয়টি প্রস্তাবই নাকচ হয়। বিভিন্ন ক্লজের উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয় ৩৬০টি যার মধ্যে ২৮০টি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নাকচ হয় এবং গৃহীত হয় ৮০টি প্রস্তাব।[১৮] আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট যে, সংসদে উত্থাপিত বিলের উপর আনীত বিরোধী দলের সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ বাতিল হওয়ার মধ্য দিয়েও সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

আর্থিক কার্যাবলী

পঞ্চম জাতীয় সংসদে মোট ৫টি বাজেট গৃহীত হয়। ৫টি বাজেট (সম্পূরক ও সাধারণ) আলোচনায় মোট ৭০ কার্য দিবসে (সম্পূরক ১৮ দিন + সাধারণ ৫২ দিন) সর্বমোট ১১৮৭ জন (সম্পূরক আলোচনায় ২১৮ জন এবং সাধারণ বাজেট আলোচনায় ৯৬৯ জন) সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথম তিনটি (১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বৎসরের বাজেট) বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করলেও শেষ দু'টি (১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বৎসর) বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেনি।[১৯] বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ গঠনমূলক হলেও পঞ্চম সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত আকারের। পঞ্চম সংসদের বাজেট অধিবেশনের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বাজেটের খাতওয়ারী আলোচনার পরিবর্তে অন্যান্য রাজনৈতিক ইস্যুকে আলোচনায় প্রাধান্য দেন। বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবসমূহ স্পীকার ভেটো দিলে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। যার ফলে বাজেট আলোচনায় বিরোধী দলের ছাঁটাই প্রস্তাবসমূহ কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নিম্নে একটি সারণির মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদের আর্থিক কার্যাবলী দেখানো হলো।

সারণি – ৫.২

পঞ্চম জাতীয় সংসদের আর্থিক কার্যাবলী (বিধি ১১১-১২৯)

বাজেট অধিবেশন	বাজেট আলোচনার দিনের সংখ্যা		আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		বাজেট পাসের তারিখ	
বাজেট উপস্থাপনের তারিখ	সম্পূরক	সাধারণ	সম্পূরক	সাধারণ	সম্পূরক	সাধারণ
১২.০৬.১৯৯১ দ্বিতীয় অধিবেশন	৩	১৫	৩৪	১৮৩	১৯.০৬.৯১	১৩.০৭.৯১
১৮.০৬.১৯৯২ ষষ্ঠ অধিবেশন	৫	১৫	৩৫	৩০৬	২৯.০৬.৯২	২৭.০৭.৯২
১০.০৬.১৯৯৩ ১০ম অধিবেশন	৩	১২	১১৮	২৯৩	২০.০৬.৯৩	৩০.০৬.৯৩
০৯.০৬.১৯৯৪ চতুর্দশ অধিবেশন	৫	৬	২১	২৯	২০.০৬.৯৪	২৯.০৬.৯৪
১৫.০৬.১৯৯৫ বিংশতম অধিবেশন	২	৪	১০	৫৮	২৫.০৬.৯৫	২৯.০৬.৯৫
মোট ৫টি বাজেট	১৮	৫২	২১৮	৯৬৯	-	-

সূত্রঃ চৌধুরী শরীফ আহমদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬)ঃ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭৭।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন (বিধি-৪১ থেকে ৫৮)

পঞ্চম জাতীয় সংসদে মোট ৩৭,৯০৭টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য ৯৩৭১টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্নগুলোর মধ্যে ৮৬৯২টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হলেও ৮,২২১টির উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রশ্নগুলো ছিল ৪১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।[২০] উক্ত ৪১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে খুব কমই প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এসব মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, নির্বাচন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স, কর কমিশন, মন্ত্রীপরিষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা, নৌ-পরিবহন, পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রভৃতি। সংসদে সাধারণত প্রশ্নোত্তর পর্বের হার দ্বারা কোনো মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার মান যাচাই করা হয়।

পঞ্চম সংসদে আলোচিত ৮২২১টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারি ও বিরোধী দল যথাক্রমে ১৩৯৫টি ও ৬৮২৬টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সরকারি দলের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের মধ্যে ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৮৯২টি, স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকা বা আঞ্চলিক বিষয়

সম্পর্কিত ছিল ৫০৩টি। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৪৭৭৫টি এবং আঞ্চলিক তথা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ছিল ২০৫১টি।[২১] নিম্নের সারণিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধিবেশনভিত্তিক প্রশ্নোত্তর পর্ব দেখানো হলো।

সারণি – ৫.৩

পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব (বিধি-৪১-৫৮)

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশ সংখ্যা		গৃহীত নোটিশের সংখ্যা		উত্থাপিত ও উত্তর প্রদত্ত প্রশ্নের সংখ্যা		বাতিল প্রশ্নের সংখ্যা		তামাদি প্রশ্নের সংখ্যা	
	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন
১ম	২০৯৬	৫০২	৭৫৬	১২৮	৫৭৮	৮৫	৫৭৫	৮০	৭৬৫	২৯৪
২য়	৫৫৮৪	১৩৫৪	১৩২৫	২৮৫	১২৮০	২৭৯	৯৫৫	২৩৯	৩৩০৪	৮৩০
৩য়	২৭৪৩	৪৭২	৪১৫	৫৫	৪১৫	৫৫	২৬২	২৯	২০৬৬	৩৮৮
৪র্থ	৪৬২১	১১৯৩	১৫৫৩	৩৫৫	১৫৫৩	৩৫৫	১৪১০	২৩৮	৩৪৫৮	৬০০
৫ম	১২৭৩	৩১৭	৭৮০	৯৮	৭৫	২৭	১২৪	৮৩	৯৮৬	১৩৬
৬ষ্ঠ	২৭৪০	৯৭৭	৭৮০	৫৭৫	৭৫৯	৫৬৩	৭৫২	৩৬৮	১৩২৯	৪৬
৭ম	১৭৫৭	৬৮৮	৩৫৯	২০৫	৩৫৯	২০৫	৩৯৭	২৮১	১০১১	২০২
৮ম	১৭৮১	৫২৯	৩৭১	২০৬	৩৪১	১৮৪	৪৬১	২৫৫	৯৪৯	৬৮
৯ম	৩২৯০	৫৫৪	৩৭৩	১৫৩	১৬৯	৬৮	৩৪০	২০৭	২৫৭৭	১৯৪
১০ম	৩১৬৫	৬৩৩	৯০৫	২৮৬	৯০৫	২৮৬	১১৫৩	৩১৩	১১০৭	৩৪
১১তম	১৮৭৬	৫৩৩	৩৪৮	১১৯	৩৪৮	১১৯	৩১৮	১৭০	১২১০	২৮৮
১২তম	৮০৪	৪০৯	৩৩২	১২৩	৩৩২	১২৩	২০৩	১১৬	২৬৯	১৭০
১৩তম	১৬৯৬	৫০০	৫৮৭	৩০১	৫৫১	২৮২	৫১১	১৭৭	৫৯৮	২২
১৪তম	৩৩১	৮৫	১১১	৩০	৯৬	২৮	২০	১২	২০০	৪৩
১৫তম	৮১৮	২০১	৩৪৭	১২৭	৩৪৭	১২৭	১০৮	৫৫	৩৬৩	১৯
১৬তম	৩৩১	৫৬	১২৩	১১	১২৩	১১	২৮	১০	১৮১	৩৫
১৭তম	২৮০	১০৫	১৩১	৭৩	১৩১	৭৩	১৩	২২	১৩৬	১০
১৮তম	১০০	২৩	৪	১১	৪৪	১১	৫	৫	৫১	৭
১৯তম	১৪৮	২৭	৩৭	৭	২১	৪	৪	২	১০৭	১৮
২০তম	৩৭৭	১৫২	২৪৩	১২৭	১৮৭	১০১	৫৫	২০	৭৯	৫
২১তম	১১৫	৯৭	৭১	৬৩	৭১	৬৩	৯	১৬	৩৫	১৮
২২তম	৭০	৫৬	১৭	২৫	৭	৮		১	৫৩	৩০
মোট	৩৭৯০৭	৯৪৬৩	৯৩৯১	৩৩৬৩	৮৬৯২	৩০৫৭	৭৭০৩	২৭৩৬	২০৮৩৪	৩৪১৩

উৎস: চৌধুরী, শরীফ আহমদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬): জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৫।

তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন

পঞ্চম সংসদে তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের নোটিশের সংখ্যা ছিল ৯৪৬৩টি। এর মধ্যে সংসদে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য ৩৩৬৩টি নোটিশ স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্নসমূহের মধ্যে ৩০৫৬টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হলেও ২৬৫৭টি পশ্নের উত্তর সংসদে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ১৬৬২টি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন এবং ৬৬৬টি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে প্রদান করলেও বাকী প্রশ্নসমূহের উত্তর তথ্য প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া হয়।[২২]

স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন (বিধি-৫৯)

স্বল্পকালীন নোটিশের মাধ্যমে সাংসদগণ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদেরকে প্রশ্ন করে থাকেন। পঞ্চম সংসদে সর্বমোট ২১৪টি স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয় ১০টি প্রশ্ন। ১৮১টি প্রশ্ন বাতিল ঘোষণা করা হয়; ৭টি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন দাতার নিকট ফেরত পাঠানো হয়; অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার কারণে ১৬টি প্রশ্ন তামাদি হয়ে যায়। স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ১০টি প্রশ্নের মধ্যে থেকে ৫টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হয়। কিন্তু আলোচিত হয় শুধুমাত্র ১টি প্রশ্ন। সংসদে আলোচিত প্রশ্নটি ছিল নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। বিরোধী দলীয় সাংসদ জনাব শেখ হারুনুর রশিদ মিয়া কর্তৃক আনীত প্রশ্নটি ছিল মংলা বন্দরে অবস্থানরত পানামা পতাকাবাহী সামুদ্রিক জাহাজ এম.ভি. পোলা এবং এম. ভি. তাছুনা জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত ও জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।[২৩] নিম্নের সারণিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্নের (বিধি-৫৯) দেখানো হলো:

সারণি – ৫.৪

পঞ্চম জাতীয় সংসদে স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন (বিধি-৫৯)

অধিবেশন	পঞ্চম জাতীয় সংসদ			
	প্রাপ্ত নোটিশ সংখ্যা	গৃহীত নোটিশ সংখ্যা	বাতিল প্রশ্নের সংখ্যা	তামাদি প্রশ্নের সংখ্যা
১ম	৩৪	১	১৯ + ৭*	৭
২য়	৫৬	৬	৫০	-
৩য়	৩০	২	২৩	৫
৪র্থ	৩৭	৩৭	-	-
৫ম	৬	১	৫	-
৬ষ্ঠ	১৭	-	১৭	-
৭ম	৫	-	৩	২
৮ম	৫	-	৫	-
৯ম	১	-	-	১
১০ম	১৩	-	১৩	২
১১তম	২	-	২	-
১২তম	-	-	-	-
১৩তম	৩	-	৩	-
১৪তম	-	-	-	-
১৫তম	১	-	-	১
১৬তম	-	-	-	-
১৭তম	১	-	১	-
১৮তম	-	-	-	-
১৯তম	-	-	-	-
২০তম	-	-	-	-
২১তম	-	-	-	-
২২তম	-	-	-	-
২৩তম	-	-	-	-
মোট	২১৪	১০**	১৭৮	১৯

* ৭টি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকর্তা সদস্যের নিকট ফেরত পাঠানো হয়।

** গৃহীত ১০টি প্রশ্নের মধ্যে ৫টি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ১টি প্রশ্নের উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সূত্রঃ চৌধুরী, শরীফ আহমদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬): জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৯।

অর্ধঘণ্টা আলোচনা (বিধি-৬০)

সংসদে তারকাচিহ্নিত বা তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত কোন বাস্তব ঘটনার বিশদ বিবরণ জানার ক্ষেত্রে, তিন দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, স্পীকার সাধারণত সপ্তাহের দু'টি বৈঠকে অর্ধঘণ্টা আলোচনার জন্য বরাদ্দ করে থাকেন।[২৪] পঞ্চম জাতীয় সংসদের অর্ধঘণ্টা আলোচনার জন্য দাখিলকৃত নোটিশের সংখ্যা ছিল ১৩৩টি। এর মধ্যে আলোচনার জন্য গৃহীত নোটিশের শতকরা হার ০.৮ শতাংশ। বাতিল নোটিশের হার ৮.৩ শতাংশ। প্রত্যাখাত নোটিশ ৯০.৯ শতাংশ।[২৫] পঞ্চম সংসদে অর্ধঘণ্টা আলোচনার জন্য গৃহীত কোনো নোটিশ সংসদীয় কমিটিতে প্রেরণ করা হয় নাই।

মূলতবী প্রস্তাব (কার্যপ্রণালী বিধি-৬২)

বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণ সরকারি নীতি ও সম্পাদিত কাজের জন্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংসদে মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করে থাকেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের তেরটি অধিবেশনে ১,৭৯০টি মূলতবী প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে আলোচনার জন্য গৃহীত নোটিশের সংখ্যা ৩৮টি। গৃহীত মূলতবী প্রস্তাবের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৫টি, জামায়াতে ইসলামীর ৭টি, এন.ডিপি'র ৩টি এবং ওয়ার্কাস পার্টি জাসদ ও জাতীয় পার্টি ১টি করে।[২৬]

আওয়ামী লীগ কর্তৃক উত্থাপিত মূলতবী প্রস্তাবের বিষয় ছিল, গোলাম আযম কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর আমীর পদ গ্রহণ; হজ্জ ক্যাম্পে পুলিশী অভিযান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র হামলা ইত্যাদি।[২৭] নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের মূলতবী প্রস্তাবের তালিকা দেখানো হলো।

সারণি – ৫.৫

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৩টি অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত মূলতবী প্রস্তাবের তালিকা

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	প্রত্যাখাত নোটিশের সংখ্যা	বিরোধী দলের নোটিশ
প্রথম ৫.০৪.১৯৯১-১৫.০৫.১৯৯১	১৮০	২	১৭৮	২
দ্বিতীয় ১১.০৬.১৯৯১-১৪.০৮.১৯৯১	৬১	০	৬১	০
তৃতীয় ১২.১০.১৯৯১-০৫.১১.১৯৯১	১৪৯	১	১৪৮	১
চতুর্থ ০৪.০১.১৯৯২-১৮.০২.১৯৯২	২৪৯	১	২৪৮	১
পঞ্চম ১২.০৪.১৯৯২-১৯.০৪.১৯৯২	৮৮	১৪*	৭৪	-
ষষ্ঠ ১৮.০৬.১৯৯২-১৩.০৮.১৯৯২	১৭	০	১৭	০
সপ্তম ১১.১০.১৯৯২-০৬.১১.১৯৯২	১২৯	০	১২৯	০
অষ্টম ০৩.০১.১৯৯৩-১১.০৩.১৯৯৩	২৯৫	৪**	২৯১	-
নবম ০৯.০৫.১৯৯৩-১৩.০৫.১৯৯৩	৭৭	২২	৫৫	১৫
দশম ০৬.০৬.১৯৯৩-১৫.০৭.১৯৯৩	৯৬	১	৯৫	১
একাদশ ১২.০৯.১৯৯৩-২৭.০৯.১৯৯৩	১৫৮	১	১৫৭	১
দ্বাদশ ২১.১১.১৯৯৩-০৮.১২.১৯৯৩	১১৬	৭	১০৯	৬
ত্রয়োদশ ০৫.০২.১৯৯৪-০৭.০৩.১৯৯৪	১৭৫	১১	১৬৪	১১
সর্বমোট	১,৭৯০	৬৪ (১০০%)	১,৭২৬	৩৮ (৫৯.৩৭%)

*পঞ্চম অধিবেশনে রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থির উপর গৃহীত ১৪টি নোটিশ আলোচিত হয়। উক্ত অধিবেশনে বাতিল নোটিশের অধিকাংশই ছিল গোলাম আযম এবং গণআদালত সম্পর্কিত, যা নোটিশে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

**গৃহীত নোটিশের বিস্তারিত বিবরণ জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশে পাওয়া যায়নি।

উৎস: Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: UPL, p. 153.

বেসরকারি সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (কার্যপ্রণালী বিধি-১৩০)

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২২টি অধিবেশনে মোট ৫৫৩২০টি বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ব্যালটে প্রদানের জন্য স্পীকার কর্তৃক ১৮৫০০টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৬১৭৮টি প্রস্তাব নাকচ হয়। ২০৬৪৬টি প্রস্তাব অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার কারণে স্পীকারের নিকট পেশ

করা হয়নি। সংসদে আলোচিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ৬৩টি ছিল সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের, যার মধ্যে ৪১টি জাতীয় বিষয়ভিত্তিক এবং ১২টি নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে টেলিভিশন রিলেসেন্টার স্থাপন, কলেজ সরকারিকরণ, বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু, নদী ড্রেজিং, সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ, বিবাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ, রাস্তা সম্প্রসারণ, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি।[২৮]

সংসদে উত্থাপিত বিরোধী দলীয় ৪৯টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩৪টি জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ১৫টি আঞ্চলিক তথা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে সুদমুক্ত কৃষি ঋণ ব্যবস্থা, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ, মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধকরণ, প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় নৌ পুলিশ গঠন, সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ বিক্রিতে ভুর্তকী প্রদান ইত্যাদি। পঞ্চম সংসদে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে দু'টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ৩টি প্রস্তাব স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ সাপেক্ষে পরবর্তীতে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়।[২৯]

অনাস্থা প্রস্তাব

সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার বা সরকারের দায়িত্বশীলতা কার্যকর করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন। ব্রিটিশ সংবিধানে অনাস্থা প্রস্তাবের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে Chalmers এবং Hood Philips বলেছেন যে, "When it (the Cabinet) is said to be responsible to parliament, what is meant is the convention that when their policy is ... Condemned by the House of Commons, they must resign. Such Condemnation may be expressed in two ways: either a measure of substantial importance, introduced or adopted by the Government may be rejected, or a vote of censure may be carried against the government".[৩০] সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবটি মন্ত্রীসভার কোনো একজন বিশেষ সদস্যের বিরুদ্ধে কিংবা সমগ্র মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনা যায়। সাধারণত বিরোধী দলের সদস্যরাই অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে থাকেন। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। সংসদ সচিবালয়ের সচিবের বরাবর অন্তত ৩ দিনের নোটিশ প্রদান করে যে কোনো সদস্য মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আস্থাহীনতা জ্ঞাপন করে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করতে পারেন।[৩১] উত্থাপিত প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি সচিব যথাশীঘ্র প্রধানমন্ত্রী ও সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করেন। স্পীকার যদি মনে করেন প্রস্তাবটি বিধি সম্মত এবং ১৫৯(১) বিধির অপব্যবহার নয় তাহলে তিনি বিষয়টি সংসদে পড়ে শুনাবেন এবং ভোটে প্রদান করবেন। অন্যূন্য ত্রিশ জন সদস্য প্রস্তাবটির পক্ষে দণ্ডায়মান হলে স্পীকার ঘোষণা করবেন যে, প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়েছে এবং ১০ দিনের মধ্যে প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হবে।[৩২]

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদেরকে যৌথভাবে সংসদের সমর্থন এবং আস্থা অর্জন করতে হয়। অন্যথায় গৃহীত অনাস্থা প্রস্তাবে সরকারের পতন ঘটে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানে

উল্লেখ করা হয়েছে যে, "The Bangladesh Constitution contains that a government sustains till it enjoys the support of the parliament. The article 55(3) of the Constitution reads: 'The cabinet shall be collectively responsible to the parliament'. According to the article 57(2) if the Prime Minister ceases to retain support of a majority of the members of parliament he/she will resign or advise the President to dissolve the parliament. By moving no-confidence motions members of parliament can ascertain whether the Prime Minister has the support of majority members".[৩৩]

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে ১৯৯২ সালের ৫ আগস্ট পঞ্চম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, গণতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ (সিরাজ) জাতীয় সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের ৭টি নোটিশ প্রদান করে। উক্ত নোটিশগুলোর মধ্যে স্পীকার বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ আনীত নোটিশটি সংসদে আলোচনার জন্য অনুমোদন করেন। বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের আব্দুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, রহমত আলী, আজিজুর রহমান, মির্জা আজম, সিপিবির শামসুদ্দোহা, জামায়াতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী, জাসদ সিরাজের শাজাহান সিরাজ এবং জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ দেশের সার্বিক ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার চিত্র উপস্থাপন করে অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের বিষয় ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, রোহিঙ্গা শরণার্থী, সাংবাদিকদের উপর পুলিশী হামলা, প্রশাসনের রাজনীতিকরণ, আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা। ট্রেজারি বেঞ্চ ও বিরোধী দলের সাংসদগণের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক ও যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের পর স্পীকার উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করেন। অনাস্থা প্রস্তাবটি যথারীতি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়। জামায়াতে ইসলামী ভোটদানে বিরত থাকে এবং এলডিপি ও ইসলামী ঐক্যজোটের সাংসদগণসহ দু'জন স্বতন্ত্র সাংসদ সংসদে অনুপস্থিত থাকেন।[৩৪] অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হলেও বিরোধী দল অনাস্থা প্রস্তাবটি চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কটের কারণে সংসদীয় কার্যক্রমের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। শাসক দলের সংসদীয় উপনির্বাচনে মিরপুর, ঢাকা-১১ এবং মাগুরা-২ আসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে বিরোধী দল ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের জন্য দাবি জানিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলে এবং লাগাতার হরতালসহ বিভিন্ন বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করতে থাকে।[৩৫] বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় দাবিটি সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হলে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক সাংঘর্ষিক হয়ে উঠে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবিটিকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অনমনীয় মনোভাব চলাকালে বিরোধী দলীয় ১৪৭ জন সদস্য পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯৪

সালের ২৮ ডিসেম্বর সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন।[৩৬] সংসদ থেকে বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "The mainstream opposition thus resigned en masse on 28 December, 1994 keeping their parliament boycott for 300 days and creating an unprecedented example in the world's parliamentary history".[৩৭]

সংসদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগের পর একটানা ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিতিতে তাদের আসন শূন্য হবে কিনা এই মর্মে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের নিকট ব্যাখ্যা আহ্বান করলে সুপ্রীম কোর্ট সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য ঘোষণা করে। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের পরামর্শে নির্বাচন কমিশন শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলে সরকার ও বিরোধী দল সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট মেয়াদের ৪ মাস পূর্বেই পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন।[৩৮]

জাতীয় সংসদ কেন্দ্রিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থান ভারসাম্যপূর্ণ নয়। সংসদে আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রমে গৃহীত সরকারি বিলের পাশাপাশি বেসরকারি বিলের সংখ্যা নগন্য। তাছাড়া সরকারি বিলে বিরোধী দল কর্তৃক আনীত সংশোধনীসমূহ এবং বাজেট আলোচনায় বিরোধী দলের ছাটাই প্রস্তাবসমূহ সরকার দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে নাকচ হয়ে যায়। সংসদীয় নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম যথা তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন, তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন, স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন, অর্ধঘণ্টা আলোচনা, মূলতবী প্রস্তাব, বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহে বিরোধী দলের অংশগ্রহণয যথার্থ নয়। সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সংসদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগের বিষয়টি উভয় দলকে পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানে উপনীত করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ কেন্দ্রিক কার্যক্রমে সরকার ও বিরোধী দলের উল্লিখিত সহঅবস্থানের স্বরূপটি সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংযোজন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন

পঞ্চম জাতীয় সংসদের শূন্য আসন যথাক্রমে ঢাকা-১১ (মিরপুর) এবং মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে একযোগে তিনটি বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী) প্রশ্ন তোলে এবং ভবিষ্যত নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীটি জোড়ালোভাবে তুলে ধরে।[৩৯] বিরোধী দলগুলির দাবীর প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তির যৌক্তিকতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে প্রথম বারের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গঠিত হয়। ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সুসম্পন্ন হলেও তখন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সংবিধানের আওতাভুক্ত করা হয়নি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল বৃটেনে ১৯৪৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এ সম্পর্কে Al-Masud Hasanuzzaman এর Role of Opposition in Bangladesh Politics গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "... in order to hold a fair election Churchill was given the charge of establishing a 'caretaker government' consisting of conservatives, National Liberals and a few non-party or National Ministers who were prepared to continue in service".[৪০] তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ পাকিস্তানে ১৯৯৩ সালের জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়, জাতিসংঘের মধ্যস্থতায়, ১৯৯৩ সালে নামিবিয়াতে এবং ১৯৯৫ সালে মোজাম্বিক ও হাইতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।[৪১] তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি বিরোধী দলের সামনে একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে ১৯৯৪ সালের ২৩ মার্চ দেশব্যাপী অর্ধ-দিবস হরতাল পালন করে। দলগুলি ৭ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ও সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে সংসদ বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী একযোগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী উত্থাপন করে।[৪২] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে বিরোধী দলীয় সাংসদগণ ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে এই রাজনৈতিক সংকট ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক অচলাবস্থায় রূপ নেয়।[৪৩] এই চরম অস্থিতিশীলতা রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীকে উপেক্ষা করে ১৯৯৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন।[৪৪] অনুরূপভাবে জেনারেল এরশাদ বিরোধী দলগুলির নিরপেক্ষ নির্বাচন সংক্রান্ত দাবীকে উপেক্ষা করে ১৯৮৮ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। এখানে বেগম খালেদা জিয়া ও এরশাদের দলগত আদর্শের একটি সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে অনড় প্রধান বিরোধী দলগুলি খালেদা কর্তৃক ঘোষিত ষষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন প্রত্যাখান করে। দেশব্যাপী ধর্মঘট, বিরোধী দলগুলির নির্বাচন বর্জন ও ব্যাপক সহিংস ঘটনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দল বিহীন এই নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম।[৪৫]

সংবাদপত্রের সূত্রে জানা যায় যে, ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে মাত্র পাঁচ থেকে দশ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেছে। নির্বাচনে বিজয়ী দল বিএনপি ৪৮টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় এবং শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী আসন লাভ করে। ফ্রিডম পার্টি একটি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ দশটি আসন লাভ করে।[৪৬] দেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল FEMA (Fair Election Monitoring Alliance) তাদের নির্বাচন উত্তর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, নির্বাচনে শতকরা ১৫ ভাগেরও কম ভোটার ভোট দিয়েছে। New York Times পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে শতকরা ১০ ভাগ ভোটার তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। এছাড়া কিছু বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ধারণা নির্বাচনে ৭ থেকে ৮ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছে।[৪৭]

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ। সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরে প্রচণ্ড গণদাবীর মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ ১৯৯৬ মধ্যরাতে ২৬৮-০ ভোটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটি পাশ হয়।[৪৮]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীকে উপেক্ষা করে বিএনপি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করলেও ক্ষমতাকে সুসংহত করতে পারেনি। জনদাবী পূরণে বিএনপি সরকার সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংযোজন করতে বাধ্য হয়। যদিও পরবর্তীকালে উচ্চতর আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রহিতকরণ করা হয়। অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সাংঘর্ষিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এরূপ বিবাদমান সম্পর্কের কারণে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সহনশীলতা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়।

উপসংহার

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা থেকে এ কথা বলা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক ছিল একইসাথে সহযোগিতামূলক এবং বিরোধিতামূলক। ১৯৯১ সালে গঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে সংসদ প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মতো একটি সহযোগিতামূলক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চম সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের এই সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করতে পারেনি। বিরোধী দল ১৯৯২ সালের ৫ আগস্ট সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। যদিও অনাস্থা প্রস্তাবটি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়। পঞ্চম সংসদের মাগুরা-২ ও ঢাকা-১১ আসনের উপ-নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হলে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতীয় নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার অভিপ্রায়ে বিরোধী দল কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীটি সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে তরান্বিত করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীর প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলের সংসদ থেকে ঘন ঘন ওয়াক আউট বয়কট পর্যন্ত গড়ায়। সর্বশেষ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করলে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক সাংঘর্ষিক হয়ে উঠে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমও বিরোধিতামূলক। আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রমে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক নয়। সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

আনীত বেসরকারি বিলের অধিকাংশই বাতিল হয়ে যায়। সংসদের তদারকিমূলক কার্যক্রমে ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক। সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের প্রাপ্ত নোটিশের অধিকাংশই স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে। পরিশেষে বলা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেলেও শেষ পর্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের আন্তঃসম্পর্ক ছিল বিরোধিতামূলক। সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই পঞ্চম সংসদ সংসদীয় গণতন্ত্রের শুভ সূচনা করলেও শেষ পর্যায়ে এসে এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১। হোসেন, গোলাম এবং আহমদ, তৌফিক, "বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৯১ ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যত", হোসেন, গোলাম, সম্পাদিত, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

২। Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: University Press Limited, p. 138.

৩। *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহার*।

৪। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, ঢাকা: ইউপিএল, পৃ. ৩৭।

৫। হোসেন, গোলাম, সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩১।

৬। Baxter Craig and Rahman Syedur (1991), "Bangladesh Votes 1991, Building Democratic Institution", *Asian Survey,* vol. xxxi, no. 8, August, p. 687.

৭। Maniruzzaman, Talukder (1992), "The Fall of the Military Dictator, 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh", *Journal of Pacific Affairs,* vol. 65, no. 2, Summer, p. 211.

৮। Hakim, Md. Abdul (2001), *The Changing forms of Government in Bangladesh: The Transition to Parliamentary System in 1991 in Perspectives*, Dhaka: Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, pp. 60-61.

৯। হোসেন, গোলাম, সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৬-২৬৭।

১০। সরকার, অজিত এবং বেগম, দিলারা (১৯৯৬), "এক নজরে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী রিপোর্টিং", *সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)*, ঢাকা, পৃ. ১১৫।

১১। Hakim, Md. Abdul, *op.cit.*, p. 62.

১২। *Ibid*, p. 64.

১৩। *Ibid*, p. 66.

১৪। *Ibid*, p. 68.

১৫। চৌধুরী, হাসানুজ্জামান (১৯৯২), *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকা: অক্ষর, পৃ. ২৭।

১৬। Hakim, Md. Abdul, *op.cit.*, pp. 81-82.

Dhaka University Institutional Repository

১৭। Riaz, Ali (2013), *Inconvenient Truths about Bangladesh Politics*, Dhaka: Prothoma Prokashan, p. 11.

১৮। চৌধুরী, শরীফ আহমেদ, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬) জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬৬।

১৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

২০। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

২১। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

২২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

২৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

২৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২।

২৫। Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh*, England: Ashgate Publishing Company, p. 112.

২৬। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 153.

২৭। *Ibid*, pp. 153-154.

২৮। চৌধুরী, শরীফ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

২৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

৩০। Firoj, Jalal (2012), *Democracy in Bangladesh Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Dhaka: Bangla Academy, p. 176.

৩১। চৌধুরী, শরীফ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬।

৩২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

৩৩। Firoj, Jalal, *op.cit.*, p. 177.

৩৪। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, pp. 150-151.

৩৫। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২।

৩৬। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 172.

৩৭। *Ibid*, p. 172.

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। চৌধুরী, শরীফ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২।

৩৯। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, pp. 163-164.

৪০। *Ibid*, p. 180.

৪১। *Ibid*, p. 180.

৪২। *Ibid*, pp. 164-165.

৪৩। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২।

৪৪। Khan, Zillur R. (1997), "Bangladesh Experiments with Parliamentary Democracy", *Asian Survey*, vol. xxxvii, no. 6, June, p. 579.

৪৫। খানম, খাদিজা (২০০১), *এক নজরে সপ্তম জাতীয় সংসদ: নির্বাচনী রিপোর্টিং*, ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), পৃ. ১২২।

৪৬। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩।

৪৭। Mannan, Md. Abdul, *op.cit.*, p. 138.

৪৮। Hakim, Md. Abdul, *op.cit.*, p. 93.

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম জাতীয় সংসদ ১৯৯৬-২০০১: সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ভূমিকা

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমে, সরকার ও বিরোধী দলের দলগত অবস্থান ও ভূমিকার পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণের পাশাপাশি পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্য পূরণে এ অধ্যায়ে সপ্তম জাতীয় সংসদের গঠন, আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রম, সংসদীয় তদারকিমূলক কার্যক্রম, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি-৭১), সংসদ বিতর্কের আচরণ ও বিষয়বস্তু, সরকার ও বিরোধী দলের পরস্পর অভিযোগ, সংসদ সদস্যদের আচরণ, স্পীকারের অবস্থান ও নিরপেক্ষতা, সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা এবং এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষক কর্তৃক নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের লক্ষ্যে অষ্টম জাতীয় সংসদের (২০-২৩ তম) অধিবেশন পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের আলোকে সংসদ বিতর্ক কার্যক্রমের পর্যালোচনাও এ অধ্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জুন ১৯৯৬

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর ৩০ মার্চ ১৯৯৬ খালেদা জিয়া সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে পদত্যাগ করেন। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান ১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন।[১] ক্ষমতা গ্রহণের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান উপদেষ্টার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া সরকারকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।[২] রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন তারিখে নির্বাচনের দিন ধার্য করেন।[৩]

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৫,৬৬,৭০,০২২ জন ভোটারের মধ্যে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ৪,২৪,১৮,২৬২ টি, যার শতকরা হার ছিল ৭৪ ভাগ।[৪] নির্বাচনে ৩০০ আসনের বিপরীতে ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী ৩০০টি আসনেই

প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। জাতীয় পার্টি ২৯৩টি আসনে, ইসলামী ঐক্যজোট ১৬৫টি আসনে এবং জাসদ (রব) সহ অন্যান্য দল ৯৩৫ জন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। এই নির্বাচনে ২৮১ জন ছিল স্বতন্ত্র পার্থী।[৫] নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৪% ভোট পেয়ে ১৪৬টি আসন লাভ করে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিএনপি ৩৩.৬১% ভোট পেয়ে ১১৬টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি ১৬.৩৯% ভোট পেয়ে ৩২টি আসন, জামায়াতে ইসলামী ৮.৬১% ভোট পেয়ে ৩টি আসন, ইসলামী ঐক্যজোট ১.০৯% ভোট পেয়ে ১টি আসন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ রব) ০.২৩% ভোট পেয়ে ১টি আসন এবং নির্দলীয় প্রার্থী ১টি আসন লাভ করে।[৬] নিম্নের সারণিতে নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো।

সারণি – ৬.১

১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	জয়ী আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৩০০	১,৫৮,৮২,৭৯০	৩৭.৪৪	১৪৬
বিএনপি	৩০০	১,৪২,৫৫,৯৮২	৩৩.৬১	১১৬
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৬৯,৫৪,৯৮১	১৬.৪	৩২
জামায়াতে ইসলামী	৩০০	৩৬,৫৩,০১৩	৮.৬১	৩
ইসলামী ঐক্যজোট	১৬৫	৪,৬০,৯৯৭	১.০৯	১
অন্যান্য দলসহ জাসদ (রব)	৯৩৫	৭,৬০,৩৬৭	১.৭৯	১ জাসদ (রব)
স্বতন্ত্র	২৮১	৪,৫০,১৩২	১.০৬	১
মোট	২৫৭৪	৪,২৪,১৮,২৬২		

উৎসঃ Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics,* Dhaka: UPL, p. 208.

জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মধ্যে এক সমঝোতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ কর্তৃক মনোনীত ২৮ জন এবং জাতীয় পার্টি কর্তৃক মনোনীত ২ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন।[৭] নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ গ্রহণের পর এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "সরকার ও বিরোধী দলকে গণতন্ত্রের স্বার্থে একত্রে কাজ করতে হবে"। পক্ষান্তরে বিএনপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলে এবং ১০০টিরও বেশী নির্বাচনী কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের দাবী করে।[৮]

বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে সাধারণভাবে একমত পোষণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ভিত্তিক National Democratic Institute এর প্রতিনিধি দলের নেতা কংগ্রেসম্যান Stephen Solarz আশা প্রকাশ করে বলেন যে, এখন বাংলাদেশে রাজপথের পরিবর্তে সংসদে রাজনৈতিক বিবাদের সমাধান হবে।[৯] জাপানী পর্যবেক্ষক দলের প্রতিনিধি Sakurai বলেন, "we have an impression that the election was conducted fairly, peacefully and in and orderly manner on the whole"[১০] বিদেশী সংবাদপত্রে Dawn, Asia Week, The Hindu নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়। দেশের সবগুলি সংবাদপত্রও একই মতামত প্রকাশ করে।[১১] দেশীয় পর্যবেক্ষক দল FEMA (Fair Election Monitoring Alliance) কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন শান্তিপূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে।[১২]

আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রম

সরকারি ও বেসরকারি বিল

সপ্তম জাতীয় সংসদ সর্বমোট ২৩টি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং এর ৩৮২টি কার্য-দিবসে ১৮৯টি বিল পাস করে।[১৩] এর মধ্যে ৪৭টি বেসরকারি বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। তম্মধ্যে ৪২টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয় এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সংসদ মেয়াদে ১টি মাত্র (মোট উত্থাপিত বিলের ২.৩৮%) বেসরকারি বিল জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়।[১৪] জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ না থাকায় বিরোধী দলের কার্যকর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে অব্যাহত সাংঘর্ষিক সম্পর্ক বজায় থাকায় গুরুত্বপূর্ণ বিল যেমন ইমডেমনিটি অর্ডিন্যান্স (রিপিল) বিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চারটি বিল, স্থানীয় সরকার বিল, কমিটি ব্যবস্থা বিল, পাবলিক সেফটি বিল ইত্যাদি বিলে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সীমিত বা শূন্য ছিল।

সারণি – ৬.২

পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারি ও বেসরকারি বিলের পরিসংখ্যানভিত্তিক চিত্র

সংসদের নাম	অধিবেশনের সংখ্যা	সরকারি বিল	বেসরকারি বিল	সর্বমোট বিল	সরকারি বিলের শতকরা হার	বেসরকারি বিলের শতকরা হার
পঞ্চম জাতীয় সংসদ	২২	১৭১	০১	১৭২	৯৯.৪২%	০.৫৮%
সপ্তম জাতীয় সংসদ	২৩	১৯০	০১	১৯১	৯৯.৪৭%	০.৫৩%
সর্বমোট	৪৫	৩৬১	০২	৩৬৩	৯৯.৪৪% (গড়)	০.৫৫% (গড়)

উৎস: Rahman, Mohammad Mahabubur, *The Role of Jatiya Sangsad in the Democratization Process of Bangladesh (1991-2013),* Ph.D. Thesis, Dhaka University, p. 246 থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিলের উপর গুরুত্ব প্রদান করে তা গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকলেও তা গৃহীত হয়নি। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে গৃহীত সরকারি বিলের পাশাপাশি বেসরকারি বিলের অবস্থান মোটেও ভারসাম্যপূর্ণ নয়। পঞ্চম সংসদে ১৭১টি সরকারি বিল গৃহীত হয়। ৮২টি বেসরকারি বিলের নোটিশ প্রদান করা হলেও গৃহীত হয় ১টি। গৃহীত বেসরকারি বিলটি হচ্ছে "The Members of Parliament (Remuneration and Allowancess) (Amendment) Bill, 1993।[১৫] অপরদিকে সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৯০টি সরকারি বিল গৃহীত হলেও ৪৭টি নোটিশ প্রদানকৃত বেসরকারি বিলের মধ্যে গৃহীত বিলের সংখ্যা ১টি। গৃহীত বেসরকারি বিলটি হচ্ছে "জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন বিল ২০০১"। ২০০১ সালে নির্বাচিত চারদলীয় জোট সরকার এই বিলটি বাতিল করে। ২০০২ সালের ২১ মার্চ জাতীয় সংসদে "জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন রহিতকরণ বিল ২০০২" নামে একটি বেসরকারি বিল পাসের মাধ্যমে আইনটি বাতিল করা হয়।[১৬]

তদারকিমূলক কার্যক্রম

সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা, জনগুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা, অর্ধঘণ্টা আলোচনা এবং মুলতবি প্রস্তাবের ওপর অসংখ্য নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ে ২৯,৫৩৭টি জমাকৃত পার্লামেন্টারি প্রশ্নের ৩২.৮ ভাগের ওপর উত্তর প্রদান করা হয়।

উল্লেখিত সময়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের ওপর পেশকৃত ১৫০০টি নোটিশের ১৩.৫ ভাগ আলোচিত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের সুযোগ সরাসরি বিরোধী দলীয় নেতা লাভ করেন। এর ফলে প্রধান নির্বাহীকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে জবাবদিহিতা দাবি করেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশে সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের এই প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।[১৭] এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'No pressing issue of national importance was reflected from such endeavours as treasury bench members through their passive queries, only highlighted success stories of the ruling party. Prime Minister's reply to the questions of the opposition MPs, as such, did not prove the transparency of the government's crucial policies in any way'.[১৮]

সপ্তম জাতীয় সংসদে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকারি দল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করলেও অর্ধঘণ্টা আলোচনা এবং মূলতবি প্রস্তাবের ব্যাপারে অনমনীয় থাকে। ফলে এ সকল নোটিশ গ্রাহ্য করা হয়নি বা প্রত্যাখাত হয়েছে। নিম্নে সপ্তম জাতীয় সংসদের তদারকিমূলক কার্যক্রমের একটি সারণি দেওয়া হলো।

সারণি – ৬.৩

সপ্তম জাতীয় সংসদের তদারকিমূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি

নোটিশ	অর্ধঘণ্টা আলোচনা N = ২১	মুলতবি প্রস্তাব N = ৪৪৫০	সংক্ষিপ্ত আলোচনা N = ৫৪০	দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব N = ১০৪৬৫	মোট N = ১৫৪৭৬
আলোচিত নোটিশ	-	-	০.৯	২.৫	১.৮
বাতিল নোটিশ	-	-	২.৮	২.২	১.৬
প্রত্যাখাত নোটিশ	১০০.০	১০০.০	৯৬.৩	৯৫.৩	৯৬.৬
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

N = সংসদ সচিবালয়ে দাখিলকৃত নোটিশের সংখ্যা

উৎসঃ Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh*, England: Ashgate Publishing Limited, p. 113.

সপ্তম জাতীয় সংসদের তদারকিমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংসদ নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারেনি। সরকারি দলের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা এবং বিরোধী দলের বিরোধিতার খাতিরে

বিরোধী ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়ে সংসদ গঠনমূলক হতে পারেনি। ফলে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়নি।

সংসদ বিতর্কের আচরণ ও বিষয়বস্তু

কার্যকর সংসদ গঠনের নিমিত্তে এবং সরকার ও বিরোধী দলের সহনশীল সম্পর্ক নির্ধারণে সংসদ বিতর্কের আচরণ ও বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংসদে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকবে এটাই সর্বজনবিদিত। জাতীয় সংসদের বিতর্ক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংসদে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা দলীয় আনুগত্য প্রদর্শনে বিতর্কের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। সংসদে অনির্ধারিত বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সংসদ সদস্যরা নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর অতিরিক্ত প্রশংসা করেন। অষ্টম সংসদের ২০তম অধিবেশনের ২৩.০২.২০০৬ কার্যদিবসে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সরকার দলীয় মহিলা সাংসদ হেলেন জেরীন খান সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শাশ্বত সুন্দরের প্রতীক বলে উল্লেখ করেন। এরূপ বক্তব্যের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে সাংসদগণ দলে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করতে চায়।

সাংসদগণ সংসদ অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের অবতারণা করেন বা প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। এ ধরনের বিষয়চ্যুতি সংসদীয় আচরণ বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংসদে অধিবেশন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, বিরোধী দলীয় সদস্যরা প্রতিদিন জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ দিয়ে থাকেন এবং সুযোগ পেলেই এ বিষয়ে বক্তব্য দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্পীকার তাদের জন্য অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করেনি।

বিতর্কের বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অষ্টম সংসদের ২২তম অধিবেশনের ২৫.০৬.২০০৬ ইং কার্যদিবসে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সরকার দলীয় সদস্য রেহেনা আক্তার রানু ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরের বাজেট আলোচনার জন্য দাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দীর্ঘ সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা নন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একটি দল গঠন করতে পারে না তিনি কীভাবে জাতির পিতা হন। এই বক্তব্য প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, দল গঠনের সঙ্গে জাতির পিতার স্বীকৃতি অর্জনের কোনো আবশ্যকতা নেই। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের সময়ে মাহাত্মা গান্ধীর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। কিন্তু মাহাত্মা গান্ধীকে ভারতের জাতির পিতার আসনে অভিষিক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনে কায়েদে আযম জিন্নাহর কোন অবদান না থাকলেও পাকিস্তানে কায়েদে আযম জিন্নাহকে জাতির পিতা হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে। রাজনীতির পরিভাষায় জাতির পিতা শব্দটি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রতীক। একটি জাতীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ পরিক্রমায় যে নেতৃত্ব জাতি

সত্তাকে সমুন্নত রেখে মানবতাবাদী দার্শনিক ভিত্তির বিশ্বাসে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তির অন্বেষায় অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সমর্থ হয় সেই নেতৃত্বই জাতির পিতার পদ অলংকৃত করেন।

অষ্টম সংসদের ২০তম অধিবেশনের ২৬.০২.২০০৬ ইং কার্যদিবসে বিএনপি'র সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য হোসেন জেরীন খান ব্যক্তিগত কৈফিয়তে দাড়িয়ে আওয়ামী লীগের সাংসদ শাহজাহান খানকে খুনি, অভদ্র, বর্বর, সন্ত্রাসী, বহু মামলার আসামী ইত্যাদি ভাষায় আক্রমণাত্মক বক্তৃতা প্রদান করেন। সরকারি ও বিরোধী দলীয় বর্ষীয়ান নেতারা সংসদ সদস্যদের এ ধরনের অসংসদীয় শব্দ (Unparliamentary Word) ব্যবহারের জন্য সংশয় প্রকাশ করেন এবং বক্তব্যে শব্দ চয়নে সতর্ক হবার আহ্বান জানান। নেতারা স্পীকারকে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শও দেন।[১৯]

অষ্টম জাতীয় সংসদের (২০ থেকে ২৩তম) ৪টি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে সংসদ সদস্যদের উপস্থাপিত বক্তব্যে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা দাবী দাওয়া এবং প্রশাসনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার মত বিষয়গুলি সংসদ বিতর্কের বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কথা থাকলেও তা পুরোপুরিভাবে কখনই কার্যকরী হয়ে উঠেনি। পঞ্চম সংসদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে, যে সংসদ বিতর্কের আচরণ ছিল স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরতান্ত্রিক এবং সংসদীয় রীতিনীতি বহির্ভূত। বিতর্কের আচরণের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করে অনাচার করাটা প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়।[২০] সংসদ বিতর্কের আচরণ ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ থাকলেও তার প্রতিফলন ঘটেনি। তার কারণ বিতর্কের বিষয় ও উপস্থাপন যথাযথ মানদণ্ডে উপনীত হতে পারেনি।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি-৬৮ এর আওতায় জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি-৭১)-এ নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে সংসদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সংসদ বিতর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে Bengal Legislative Council Proceedings Official Report অনুযায়ী বঙ্গীয় আইন সভায় বাজেট ভিত্তিক আলোচনা বেশী হলেও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কষি, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নদী-শাসন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।[২১]

প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের বিতর্ক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য বিরোধী দল সোচ্চার হলেও সরকারি দল জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে। সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা এবং জনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা ত্বরান্বিত হলেও ক্ষমতাসীন দল সব

সময়ই সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে জবাবদিহি করতে চায় না। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনদুর্ভোগ সম্পর্কে জনগণ অবহিত হলে ক্ষমতা হারাতে হবে।

সংসদে জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেমন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও আইন-শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয় উত্থাপনের প্রচেষ্টা উপেক্ষিত হলে বিরোধী দল সরকার বিরোধী বক্তব্য প্রদান করে সংসদকে উত্তপ্ত করে তোলে। এক্ষেত্রে সরকারও পাল্টা বক্তব্য এবং অসংসদীয় আচরণ প্রদর্শন করে বিরোধী দলকে হেয়প্রতিপন্য করে। সরকার ও বিরোধী দলের পরস্পর বিরোধী এই অবস্থানের কারণে সংসদে প্রত্যাশিত সহনশীল পরিবেশ চরমভাবে ব্যহত হয়। নিম্নে প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে উত্থাপিত জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রাপ্ত নোটিশের কার্যকারিতা একটি সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সারণী – ৬.৪

প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি-৬৮)

সংসদ পরিচিতি	অধিবেশনের সংখ্যা	মোট বৈঠক কাল (ঘণ্টা)	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	বাতিল নোটিশের সংখ্যা
প্রথম জাতীয় সংসদ	৮	৪২৫.৫৫	১৯	৫	১২
পঞ্চম জাতীয় সংসদ	২২	১৮৩৬	৮০৬	৮০	৭২৬
সপ্তম জাতীয় সংসদ	২৩	১৫৫৮.৬	৪৬৩	২১	৪৪৩

উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ থেকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

প্রথম জাতীয় সংসদের ৮টি অধিবেশনে ৪২৫.৫৫ ঘণ্টা সময় ব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি-৬৮) এর আওতায় সংসদে ১৯টি নোটিশ পাওয়া যায়। স্পীকার কর্তৃক ৫টি নোটিশ সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত হয় এবং ১২টি নোটিশ বাতিল করা হয়।[২২] উল্লেখ্য যে, সংসদের প্রথম অধিবেশনের তথ্য পাওয়া যায়নি এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত (৬৮ বিধিতে) জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়নি।

পঞ্চম সংসদে ২২টি অধিবেশনে ১৮৩৬ ঘন্টা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে সংসদে কার্যপ্রণালী বিধির-৬৮ আওতায় জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ৮০৬টি নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্পীকার কর্তৃক ৮০টি নোটিশ গৃহীত হয় এবং বাতিল করা হয় ৭২৬টি নোটিশ।[২৩]

সপ্তম জাতীয় সংসদের সর্বমোট ২৩টি অধিবেশনে ১৫৫৮.৬ ঘন্টা সময় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংসদে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিধি-৬৮ এর আওতায় ৪৬৩টি নোটিশ পাওয়া যায়। এর

মধ্যে স্পীকার কর্তৃক সংসদে আলোচনার জন্য ২১টি নোটিশ গৃহীত হয়। বাকী ৪৪৩টি নোটিশ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।[২৪]

উল্লেখিত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নোটিশের অধিকাংশই স্পীকার কর্তৃক বাতিল হয়েছে। পঞ্চম সংসদের তুলনায় সপ্তম সংসদে নোটিশ প্রদানের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চম সংসদ ১৮৩৬ ঘন্টা সময় ব্যয় করে ৮০৬টি নোটিশ প্রদান করলেও সপ্তম সংসদ অধিক সময় ব্যয় করে (১৫৫৮.৬ ঘন্টা) মাত্র ৪৬৩টি নোটিশ উত্থাপন করে। তিনটি সংসদের প্রাপ্ত নোটিশের মধ্যে স্পীকার কর্তৃক শতকরা ১২.১৫ ভাগ নোটিশ গৃহীত হয়েছে।

জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি-৭১)

প্রথম সংসদে ২৩১টি জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি-৭১) নোটিশ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত নোটিশের ৫১টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬২টি নোটিশ বাতিল করা হয়। গৃহীত নোটিশের আলোচনা না হওয়ায় ৩২টি নোটিশ তামাদি হয়ে যায়।[২৫]

পঞ্চম জাতীয় সংসদে জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ বিধি-৭১ এর আওতায় ৫৮৭৬টি নোটিশ পাওয়া যায়। স্পীকার কর্তৃক ৫৮১টি নোটিশ গৃহীত হয় এবং ৫২৯৯টি নোটিশ বাতিল করা হয়। গৃহীত নোটিশের মধ্যে ৩৪০টি প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিবৃতি প্রদান করেন। অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার পর ২৪১টি নোটিশ তামাদি হয়ে যায়। ২টি নোটিশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং ১টি নোটিশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[২৬]

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি-৭১ এর আওতায় জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের উপরে ১২৭৩৮টি নোটিশ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত নোটিশের ৬৩৪টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। স্পীকার ৯৭৯৪টি নোটিশ বাতিল করেন। গৃহীত নোটিশের ৩৬১টি প্রশ্নের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী বিবৃতি প্রদান করেন। বাকী ২৭৩টি নোটিশ তামাদি হয়ে যায়। এছাড়া ৭১(ক) বিধি অনুসারে ২৩২০টি নোটিশের উপর ২ মিনিট করে ২৮ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[২৭]

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির-৬৮ বিধিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ৭১-বিধিতে মনোযোগ আকর্ষণের ভিত্তিতে জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে, নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, আলোচনার সুযোগ থাকলেও তা পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়ে উঠেনি। সংসদ বিতর্ক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত অধিকাংশ নোটিশ স্পীকার বাতিল করে দেন। গৃহীত নোটিশের অর্ধেকই বিবৃতি প্রদান না করার এবং নিয়ন্ত্রিত সময়ে আলোচিত না হওয়ায় তামাদি হয়ে যায়। কার্যপ্রণালী বিধির-৬৮ ও ৭১-বিধির পাশাপাশি Point of Order-এ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্পীকার পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করেন না। সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষিত হলে

সংসদ অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ।

সরকার ও বিরোধী দলের পরস্পর অভিযোগ

সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংসদে উভয় দলের পারস্পরিক অভিযোগ পর্যালোচনা অপরিহার্য। পঞ্চম সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং সপ্তম সংসদের বিরোধী দল বিএনপি'র অভিযোগ ছিল যে, সংসদে তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বরাবরই সরকারি দলের ভাষ্য ছিল সংসদে বিরোধী দলকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী সময় দেওয়া হয়। সরকার ও বিরোধী দলের এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের কারণে প্রায়ই রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত থেকেছে। জাতীয় সংসদ পরিচালনার জন্য ২৯টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত কার্যপ্রণালী বিধিতে মোট ৩১৮টি বিধি রয়েছে। এসব বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, আর্থিক বিষয়াবলী উপস্থাপন ও বিতর্ক, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন, সদস্যদের বিশেষাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সংসদ সদস্যদের কথা বলার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।[২৮]

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে সংসদে তার দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেওয়াটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গণতন্ত্রের স্বার্থেই বিরোধী দলকে সংসদে আলোচনা করার জন্য আরো অধিক সময় দেওয়া সমীচীন। এতে সরকারের তো ক্ষতি নেই, বরং সরকার প্রকৃতপক্ষেই এতে উপকৃত হয়ে থাকে।[২৯]

পঞ্চম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা রংপুরে খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় সংসদে আলোচনার প্রস্তাব রাখেন। সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। বিরোধী দল শেখ হাসিনাকে এ ব্যাপারে পুনরায় কথা বলার সুযোগ দেবার দাবী করলে স্পীকার তা গ্রহণ করেনি। সংসদে জনগণের পক্ষে কথা বলার সুযোগ নেই এই অভিযোগে আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ন্যাপ ওয়াক আউট করে।[৩০]

সরকার ও বিরোধী দলের তিক্ত সম্পর্কের শুরু মূলত পঞ্চম সংসদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। পঞ্চম সংসদে ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিএনপি বিরোধী দলের সম্মতির ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়নের কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় প্রথম বারের মতো সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের চিড় ধরে।[৩১]

পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের বিরোধী দল সংসদে কথা বলার দাবী ইস্যুকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে হরতালকে অন্যতম কৌশল বলে মনে করেছে। হরতালের পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল প্রতিবাদের ভাষায় হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। সরকার সংসদে কথা বলার সুযোগ দেয় না, বিরোধী দলের এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ুন

রশীদ চৌধুরী সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনের ০৫.০৬.২০০০ ইং কার্যদিবসের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, "সংসদে বিএনপি ১৩টি অধিবেশনে উপস্থিত থেকে ৩৬৬ ঘন্টা ৩৭ মিনিট সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া সংসদের ২৮৭টি কার্যদিবসের মধ্যে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাত্র ২৭ দিন সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। স্পীকার বলেন, সরকারি দলের ন্যায় বিরোধী দলকে প্রায় সকল আলোচনায় পর্যাপ্ত এমনকি কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য সরকারি দলের তুলনায় অধিক সময় প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ বর্জন এবং ওয়াক আউটের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিরোধী দলের সদস্যদের বিভিন্ন আলোচনায় আরও অধিক সুযোগ দেওয়া যায় নাই। কিন্তু স্পীকার কথা বলার সুযোগ দেয়নি এই অভিযোগে পঞ্চম সংসদের বিরোধী দল সংসদ অধিবেশন থেকে ৭৬ বার ওয়াক আউট করে। অপরদিকে সপ্তম সংসদের বিরোধী দল সংসদ থেকে ৬১ বার ওয়াক আউট করে।[৩২] সংসদে স্পীকারের পক্ষপাতিত্ব, বিরোধী দলকে সময় না দেওয়া, মুলতবি প্রস্তাবসহ অন্যান্য প্রস্তাব অনুমোদন না করা; বিলের সংশোধনী গ্রহণ না করা, মন্ত্রীদের বিরোপ মন্তব্যের প্রতিবাদ এবং বিলের সূচনা বা শিরোনাম গ্রহণের প্রতিবাদে বিরোধী দল বার বার ওয়াক আউট করে।[৩৩]

জাতীয় সংসদে প্রথম ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে প্রথম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের ০৭.০৬.১৯৭৩ ইং কার্যদিবসের বাজেট অধিবেশনে। ৩ মিনিটের জন্য সংসদ কক্ষ বর্জন করেন ৩ জন সদস্য। এরা হলেন, ভাসানী, ন্যাপের ব্যারিস্টার সালাউদ্দিন এবং জাসদের আব্দুস সাত্তার ও মঈনউদ্দিন আহমদ মানিক। সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে এই মর্মে ব্যারিস্টার সালাউদ্দিন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নটি স্পীকার কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় এই ওয়াক আউটটি ঘটেছিল।[৩৪] সংসদীয় কার্যক্রমে সাধারণত ওয়াক আউট হয়ে থাকে, Point of Order-এ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে না পারার কারণে। তাছাড়া জনস্বার্থ বিরোধী বিল পাশের বিরোধীতায় এবং বিভিন্ন সংঘঠিত ঘটনা সম্পর্কে মন্ত্রীর বিবৃতির প্রতিবাদেও ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে থাকে। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী ওয়াক আউট একটি বৈধ প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে বিরোধী দল দাবী আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে। কিন্তু বিরোধীতার স্বার্থে বিরোধীতা এই মর্মে ঘন ঘন ওয়াক আউট বাঞ্ছনীয় নয়। এ ধরনের ওয়াক আউটের ফলে সংসদ কার্যক্রম কার্যকরী হয়ে উঠে না। সংসদ পরিণত হয় একদলীয় প্লাটফরমে।

সারণি – ৬.৫

পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের ওয়াকআউটের চিত্র

কারণ	ওয়াকআউটের শতকরা হার		
	পঞ্চম সংসদ সংখ্যা-৭৬	সপ্তম সংসদ সংখ্যা-৬১	মোট সংখ্যা-১৩৭
বিল ও প্রস্তাবনার শিরোনামের প্রতিবাদে	১৮.১	৯.৮	১৪.৩
মন্ত্রিদের মন্তব্যের প্রতিবাদে	৬.৯	৯.৮	৮.৩
সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার প্রতিবাদে	৯.৭	-	৫.৩
দাবী-দাওয়া এবং বিলের সংশোধনী সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার প্রতিবাদে	৫.৬	১৪.৮	৯.৮
স্পীকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে (ক) বিধির বাইরে বিরোধী দলকে ফ্লোর না দেওয়ার প্রতিবাদে	১৮.১	৬.৬	১২.৮
(খ) মুলতবি প্রস্তাব এবং অন্যান্য প্রস্তাব গ্রহণ না করার প্রতিবাদে	৫.৬	৩.৩	৪.৫
(গ) তৈরীকৃত প্রতিবেদন গ্রহণ না করার প্রতিবাদে	১.৪	১৯.৭	৯.৮
(ঘ) অন্যান্য কারণে	১৬.৫	২৯.৫	২২.৬
মোট	১০০	১০০	১০০

উৎস: Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh*, England: Ashgate Publishing Company, p. 192.

জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নানাবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দল সরকারকে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করেনি এবং সরকারও বিরোধী দলকে আস্থায় নিতে পারেনি। বিরাজমান এই অবস্থার ফলশ্রুতিতে বিরোধী দলের ক্রমাগত সংসদ বর্জন অব্যাহত ছিল। সংসদ বর্জনের পাশাপাশি সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নানাবিধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের রাজনৈতিক কার্যক্রমও পরিলক্ষিত হয়েছে।[৩৫]

সারণি – ৬.৬

বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ অধিবেশন বর্জন ১৯৯১-২০০১

ক্রমিক নং	সংসদ	সর্বমোট কার্যদিবস	বিরোধী দল কর্তৃক বয়কট দিবস	শতকরা হার
১	পঞ্চম	৩৯৫	১৩৫	৩৪.১৮
২	সপ্তম	৩৮৩	১৬৩	৪২.৫৬
	সর্বমোট	৭৭৮	২৯৮	৩৮.৩০

উৎস: Firoj Jalal (2012), Democracy in Bangladesh Conflicting Issues and Conflict Resolution, Dhaka: Bangla Academy, p. 173.

পরিশেষে বলা যায়, সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অভিযোগের কারণে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিনিয়ত হরতাল, অবরোধ, সংসদ বর্জন, সংসদ থেকে পদত্যাগ ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী দলের এ ধরনের সরকার বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ও বিরোধী দলের দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের সংঘটিত এই পারস্পরিক বিরোধের কারণেই জাতীয় সংসদ তার অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

সংসদ সদস্যদের আচরণ

সংসদ সদস্যদের আচরণগত বিষয়টি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিনির্মাণে সহনশীলতা অপরিহার্য হলেও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্যদের আচরণে এই সহনশীল মনোভাব খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি। সংসদ সদস্যদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণগত বৈশিষ্ট্য সংসদের ভিতরে ও বাহিরে উন্নত গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। সংসদ সদস্যদের আচরণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৃটেনের হাউজ অব কমন্সেও মারামারি হাতাহাতির ঘটনা ঘটতো। এজন্যই হাউজ অব কমন্সের ট্রেজারী বেঞ্চ ও অপজিশন বেঞ্চের মাঝখানে অনেকখানি ফাকা জায়গা রাখা আছে। ওখানে অফিস সহকারীরা বসে। কিন্তু এই জায়গাটা ইচ্ছাকৃতভাবেই রাখা হয়েছে। যাতে দু'পক্ষের মধ্যে সহজে মারামারি লেগে যেতে না পারে।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের পার্লামেন্টেও মারামারি গালাগালির অপ্রীতিকর ঘটনার নজির আছে। ভারতের ইউনাইটেড প্রভিন্সের প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলিতে মারামারি হয়েছে মদের বোতল নিয়ে। হংকংয়ের এসেম্বলিতেও সদস্যদের মধ্যে গলা ধাক্কা কিল-ঘুসির ঘটনা ঘটেছে। যা বিবিসি ও সিএনএন এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান সরকারের সময় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের দল কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে পার্লামেন্টে চেয়ার ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় তৎকালীন ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী মারা যান।[৩৬] আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উল্লেখিত দেশের পার্লামেন্টসমূহে কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনার উদ্ভব হলেও এই সমস্ত দেশগুলি বর্তমানে উন্নত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিতপরে গণতন্ত্রের সূচনাপর্বে প্রথম জাতীয় সংসদের বিতর্ক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত আচরণ একটি সহনশীল মাত্রায় ছিল।

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সেনা শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন সংসদে সামরিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতা বিরোধী, মৌলবাদী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটে। এ সময়ে সংসদে নানাবিধ পেশার বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত আচরণে যে ঔদ্ধত্য দৃশ্যমান হয়েছে, তার শুরুটা মূলত এখানেই। '৯০-এর গণআন্দোলনের পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা হলেও সংসদ সদস্যদের আচরণগত ত্রুটি অবদমিত হয় নাই।

পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ সদস্যদের আচরণ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সাংসদদের পারস্পরিক আচরণ প্রবলভাবে বিরোধপূর্ণ। এর পেছনে মূলত কারণ ছিল সংসদে কথা বলতে না পারা এবং দলীয় বিরোধীতা। পঞ্চম জাতীয় সংসদে পরস্পরকে জুতা প্রদর্শন, হৈ চৈ করে অন্যকে বাধা দেওয়া, গালি-গালাজ ও বিশ্রী কটাক্ষ করা, মারমুখী হওয়ার মত বিষয়গুলি লক্ষ করা যায়।[৩৭] অনুরূপভাবে সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৯৯৮ সালের ১৫ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) হরতালের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি প্রদানকালে বিরোধী দলীয় বিএনপি'র সদস্যগণ প্রচণ্ড হৈ-চৈ, টেবিল চাপড়ানো, মাননীয় স্পীকারের প্রতি কটুক্তি ও অসদাচারণ, টেলিভিশন ক্যামেরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া ও কর্মকর্তাদের বইপত্র ছুড়ে মারাসহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন।[৩৮]

আচরণের এই ধারাবাহিকতা অষ্টম সংসদেও বিদ্যমান ছিল। অষ্টম সংসদের ২৩তম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সমালোচনা করে বক্তৃতা প্রদান করলে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সরকার দলীয় কতিপয় সংসদ সদস্যগণ অবজ্ঞাসূচক উচ্চস্বরে হর্ষ ধ্বনি দিয়ে অসম্মানজনক আচরণ প্রদর্শন করতে থাকেন। সংসদ নেত্রী খালেদা জিয়ার বক্তৃতা চলাকালে অবশ্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি।[৩৯]

সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সদস্যদের অপ্রত্যাশিত আচরণে প্রতিনিয়ত সংসদের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। অষ্টম সংসদের ২০, ২১, ২২ ও ২৩তম অধিবেশন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, সংসদ সদস্যগণ বিতর্ককালীন সময়ে বিতর্কের বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করে প্রতিপক্ষের বক্তব্য প্রতিহত করতে ধমক দিয়ে চেচামেচি করে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি করে থাকেন যা খুবই দৃষ্টিকটু মনে হয়।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৮তম অধ্যায়ে সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পালনীয় বিধির ২৬৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সংসদের বৈঠক চলাকালে শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হয়েছে।[৪০] কিন্তু জাতীয় সংসদের অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি সংসদ সদস্যগণ মেনে চলেন না। প্রতিটি অধিবেশনেই কার্যপ্রণালীর আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের সাংসদদের আচার-আচরণ অনেক সময় খোদ সরকারকেই একটি বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। বিরোধী দলের সদস্যরা সরকার দলীয় সদস্যদের বিরোধপূর্ণ বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। এই সমস্ত বিরোধের প্রতিক্রিয়ায় সংসদে ফাইল পেটানো, স্পীকারের দিকে তেড়ে যাওয়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে যা সংসদীয় আচরণকে ব্যাহত করে।[৪১] সংসদের বাইরে ও ভিতরে যে ভাষা নেতা-নেত্রীদের বক্তৃতা বা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা চূড়ান্তভাবে উষ্কানীমূলক ও আপত্তিকর। যার ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণকে অন্তঃসারশূন্য, বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও প্রতিশোধমূলক বলে বর্ণনা করা হয়। এসব বক্তৃতা অন্তঃদলীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈরী প্রভাব এবং প্রায়ই সহিষ্ণুতায় প্ররোচনা ও রাজনৈতিক শত্রুতা সৃষ্টি করে।[৪২] এ ধরনের ধারণা সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন, জনস্বার্থের প্রতি চরম অবজ্ঞা, ক্ষমতায় বসার উগ্র বাসনা এবং প্রচণ্ড লুণ্ঠন প্রবণতা বিদ্যমান।[৪৩] সংসদ সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের অবাঞ্ছিত অনৈতিক প্রবণতার পেছনে মূলত রাজনৈতিক দলগুলির ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতিহীন রাজনীতি নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে থাকে। সংসদ সদস্যদের পারস্পরিক অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমেই শুধু সংসদের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না। কোরাম সংক্রান্ত জটিলতাও পার্লামেন্টের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চম সংসদের ২২টি অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ১৮০.১২ জন এবং সপ্তম সংসদের ২৩টি অধিবেশনের গড় উপস্থিতি ছিল ১৬৮.৭২ জন।[৪৪] কোরাম সংকটের মধ্যে দিয়ে সংসদ সদস্যদের সময় নিষ্ঠতার পরিচয় ফুটে উঠে। যা আচরণগত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সংসদ সদস্যদের আচরণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বহির্ভূত হওয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটি দূরত্বের সৃষ্টি হয়। যার ফলে উভয় দলের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাড়াতে পারেনি।

স্পীকারের অবস্থান ও নিরপেক্ষতা

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় স্পীকারের নিরপেক্ষতা অপরিহার্য। কিন্তু জাতীয় সংসদের স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধী দলের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। স্যার আইভর জেনিংস (Sir Ivor Jennings)-এর ভাষায় স্পীকারের প্রধান দায়িত্ব হলো, "The Speaker is the Protector of the rights of the minorities".[৪৫] স্পীকার এ কাজে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রথম গণপরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্য শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত নিরপেক্ষতার প্রশ্নে স্পীকারকে লক্ষ্য করে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, ইংল্যান্ডের স্যার আলেকজান্ডার মেরিমেন্ট স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর এই কথাটাই বলেছিলেন, "It is

the duty of the chair to protect the minority and secure the exercise of the right of expression of opinion, however unpopular they may be".[৪৬]

নিরপেক্ষভাবে সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালীর ১৪ বিধিতে স্পীকারকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[৪৭]

সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধিগুলি প্রয়োগ করে স্পীকার তার নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারেন। সংসদে যখন সরকার ও বিরোধী দল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েন। স্পীকার তখন হাউজে ঐ বিষয়টি ভোটে দিতে পারেন।[৪৮] কোনো বিষয়ের উপর ভোট প্রদানের সময় উভয় পক্ষের ভোট সমান হলে স্পীকার কাষ্টিং ভোট (Casting Vote) প্রদান করেন।[৪৯] এছাড়া স্পীকার হাউজের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে তার রুলিং (Ruling) প্রদান করেন। সদস্যরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিংবা সংসদের ভিতরে বা বাহিরে স্পীকারের রুলিংয়ের সমালোচনা করতে পারে না। স্পীকারের রুলিং নিয়ে কোনো প্রশ্নও তোলা যায় না।[৫০]

স্পীকারের রুলিং ভবিষ্যতের নজির হিসেবে উল্লেখ করার জন্য সংরক্ষিত হয়।[৫১] এভাবেই পার্লামেন্টে স্পীকারের অবস্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে সমাসীন। স্পীকার তার এই অবস্থানকে নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে সমুন্নত রাখতে পারেন। জাতীয় সংসদের স্পীকার পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শন করে নিজের নিরপেক্ষতাকে অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে গণতন্ত্রী দলের সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, কথা বলার দাবীতে বারংবার স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস তাকে বসানোর বন্দোবস্ত না করে যা-তা বলে সার্জেন্ট এ্যাট আর্মসকে নির্দেশ দেন, তাকে সংসদ কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। এই ঘটনায় সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা স্পীকারের আচরণে মর্মাহত হন। বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেন এবং স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার ঘোষণা দেন। পরে সরকারি দলের ডেপুটি লিডার ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও অন্যান্যের মাধ্যমে সমঝোতা হয়। এরপর সরকারি দল স্পীকারের আচরণে দুঃখ প্রকাশ করে। স্পীকারও সরকারি দলের মনোভাব বুঝে ঐ অধিবেশনেই নরম সুরে আপোসে আসেন।

পঞ্চম সংসদের স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতির অভিযোগ ছিল যে, বিরোধী সংসদ সদস্য তার শ্যালক রাশেদ খান মেনন ফ্লোর চাইলেই দিয়ে দিতেন। তাছাড়া কাউকে অতিরিক্ত সময় ধরে সুযোগ দান, কাউকে অপ্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করে থামিয়ে দেওয়া, কখনও কখনও কাউকে দৃষ্টিকটুভাবে এড়িয়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলি একপেষে নীতিরই প্রতিফলন বলে মনে হয়েছে।[৫২] সপ্তম সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিএনপি'র বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদে কথা বলতে না দিয়ে স্পীকার তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছেন, এ অভিযোগে ওয়াক আউট করেন।

তারা স্পীকারের বিরুদ্ধে কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন ও পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ আনেন। বিরোধী দল বিএনপি ফ্লোর ক্রসিং এর অপরাধে সংসদ সদস্য স্বপন ও আলাউদ্দিনকে দল থেকে বহিষ্কার করে তাদের সংসদ সদস্যপদ বাতিলের জন্য স্পীকারকে অনুরোধ জানান। এ ব্যাপারে স্পীকার তার প্রদত্ত রুলিংয়ে বলেন, তাদের সদস্যপদ শূন্য হয়নি। এই রুলিংয়ের প্রতিবাদে বিএনপি সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে এবং দীর্ঘদিনের জন্য সংসদ বর্জন করে।[৫৩]

অষ্টম জাতীয় সংসদের অধিবেশন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, বিরোধী দলীয় সদস্যরা Point of Order-এ দাড়িয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করে বক্তব্য প্রদান করেন এবং সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন। স্পীকার বিরোধী দলীয় সদস্যদের বক্তব্যে পদত্যাগ, ব্যর্থতা ইত্যাদি শব্দগুলি অসংসদীয় উল্লেখ করে বাতিল করেন। স্পীকার কর্তৃক এ ধরনের শব্দ বাতিলের প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুল হামিদ বলেন, সরকারের পদত্যাগ করা উচিৎ এ ধরনের বক্তব্য অসংসদীয় নয়। পৃথিবীর সব সংসদেই সরকারের পদত্যাগ চাওয়া হয়। তিনি বলেন, স্পীকার তো সরকারের অংশ নয়। তিনি অবিলম্বে স্পীকারের এই ঘোষণা প্রত্যাখানের দাবী জানিয়ে বলেন, অন্যথায় আমরা ওয়াক আউট করব। স্পীকার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে পরে এ ব্যাপারে রুলিং দিবেন বলে ভূমি উপমন্ত্রীকে ফ্লোর দেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। বিরোধী দলীয় সদস্যদের বক্তব্যকে সমর্থন করে নৌ-পরিবহন মন্ত্রী (অবঃ) কর্নেল আকবর হোসেন বলেন, বিরোধী দল সরকারের পদত্যাগ চাইবে এটাই স্বাভাবিক। অতীতে আমরাও চেয়েছি।

স্পীকার যাতে নিরপেক্ষভাবে সংসদ পরিচালনা করতে পারে সেজন্য বৃটিশ পার্লামেন্টের স্পীকারের বেতন সংযুক্ত তহবিল থেকে দেওয়া হয়।[৫৪] নিরপেক্ষতার স্বার্থে স্পীকার পদের স্থায়ীত্ব নির্ধারণে বৃটেনে এ ধরনের পদক্ষেপের ঐতিহ্য রয়েছে। ১৭৩৩ সাল থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের 'হাউজ অব কমন্সে' চার্জ লটেন একটানা ৩৩ বছর স্পীকার ছিলেন। এছাড়া ব্রিটেনের আইলক স্যাণ্ড দ্বীপের 'হাউজ অব কিম'-এ স্যার চার্জ কেরম ১৯৮১ সাল থেকে ২৫ বছর স্পীকার ছিলেন। স্পীকারের অবস্থান ও নিরপেক্ষতাকে সুসংহত করার অভিপ্রায়ে স্পীকার পদের স্থায়ীত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভারতেও দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধান সভার স্পীকার হাসিম আব্দুল হালিম ১৯৮২ সাল থেকে একটানা ২৫ বছর স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৫] বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি।

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নির্ভর করে স্পীকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের উপর। কিন্তু জাতীয় সংসদের স্পীকারগণ বিরোধী দল কর্তৃক বরাবরই অভিযুক্ত হয়েছেন সরকারি দলের লোক হিসেবে। স্পীকার মূলত তার নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন। সুতরাং প্রাপ্ত

তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্পীকারের পক্ষপাতমূলক আচরণও সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কে তরান্বিত করেছে।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা এবং এর কার্যকারিতা

আধুনিক পার্লামেন্টে কার্যকর কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর সে দেশের পার্লামেন্টকে সার্থক ও গতিশীল বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে মরিস জোনস (Morris Jones) এর উক্তি হলো, "... a legislature may be known by the committees it keeps".[৫৬] সংসদীয় কমিটিগুলো আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে কার্যকর একটি উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে।[৫৭] সংসদীয় কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে আনুপাতিক হারে সরকার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। কমিটির বৈঠকে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ অত্যন্ত নিরিবিলি ও হৃদতাপূর্ণ পরিবেশে জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আইন প্রণয়নে দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। এ ধরনের আলোচনা থেকে উভয় দলের সদস্যগণ নির্দিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছান এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন।

সারণি – ৬.৭

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি

কমিটির প্রকৃতি	কমিটির সংখ্যা						
	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ	৮ম সংসদ
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি	-	৩৬	-	৩৫	৩৫	৩৫	৩৭*
অর্থ এবং অডিট কমিটি	৩	৩	-	৩	৩	৩	৩
অন্যান্য স্ট্যান্ডিং কমিটি	৮	৮	৪	৮	৮	৮	৮
বিশেষ সিলেক্ট কমিটি	৩	৪	২	২	৭	২	-
মোট	১৪	৫১	৬	৪৮	৫৩	৪৮	৪৮

* প্রথমে ৩৯টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ৪টি কমিটিকে ২টিতে অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত কমিটি সংখ্যা হয় ৩৭।

উৎস: Ahmed, Nizam, Obaidullah, A. T. M. (2007), ed., The Working of Parliamentary Committees in Westminister Systems (Lessons for Bangladesh), Dhaka: The University Press Limited, p. 41.

সংসদকে কার্যকরী করার জন্য সংসদীয় কমিটি গঠিত হলেও দেখা গেছে যে, পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশনের ০৫.০৪.১৯৯১ কার্যদিবস থেকে শুরু করে তৃতীয় অধিবেশনের ০৫.১১.১৯৯১ কার্যদিবস

পর্যন্ত কার্য উপদেষ্টা কমিটির পাঁচটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোনো বৈঠকেই উপস্থিত থাকেননি। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন কেবল একটি বৈঠকে।[৫৮] অন্যান্য কমিটির সদস্যদের উপস্থিতির হারও হতাশাব্যঞ্জক। সংসদ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করার জন্য কমিটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। যদি কমিটির সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহলে কমিটিগুলোর কাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর ফলে শাসন বিভাগীয় কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা বিলম্বিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে কাজগুলো বাদ পড়ে যেতে পারে।[৫৯]

সারণি ৬.৮

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতির হার

ক্রমিক নং	সংসদ	সর্বমোট কার্যদিবসের সংখ্যা	সংসদ নেতার উপস্থিতি	বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি
১	পঞ্চম	৩৯৫	২৫৬ (৬৫%)	১১৯ (৩০%)
২	সপ্তম	৩৮৩	২৯৮ (৭৭.৮১%)	২৮ (৭.৩১%)

উৎস: Firoj, Jalal (2012), *Democracy in Bangladesh Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Dhaka: Bangla Academy, p. 196.

কমিটির কার্যকারিতার জন্য সদস্যদের নিয়মিত সভায় মিলিত হওয়া এবং কমিটির সুপারিশগুলো সরকারের নিকট উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। যে কোনো দেশের সংসদীয় কমিটিগুলোর ভূমিকা এবং কার্যক্রম নির্ভর করে ঐ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ও সংসদের প্রতি সরকারের অভিমতের উপর।[৬০] বাংলাদেশে কমিটিগুলোতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দলীয়, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচিত হয়ে আসছে। যোগ্য ও আগ্রহী ব্যক্তিদের সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। এর ফলে কমিটির কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায় না। জাতীয় সংসদে সংসদ নেতা কর্তৃক অধিকাংশ কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য মনোনীত হওয়ার ফলেও সংসদীয় প্রাধান্য কার্যকর হয়ে উঠেনি। কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক নতুন সংসদের উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র সংসদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন বলে বিধান থাকলেও কোনো সংসদই তা করেনি। পঞ্চম সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত হয় প্রায় ৭ মাস পর। সপ্তম জাতীয় সংসদে সংসদ গঠনের প্রায় ১ বছর ৪ মাস পর স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদে কমিটি গঠিত হয় ১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন পর।[৬১] এছাড়া কমিটির কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জনশক্তি ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। কমিটি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার বিষয়গুলিও কমিটির কার্যক্রমের সফলতার অন্তরায়।

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য UNDP এর সহায়তায় সংসদীয় গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।[৬২] SPD প্রকল্পের রিপোর্টে সংসদ ও সংসদীয় কমিটিতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর অধিকারকে সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।[৬৩]

সংসদীয় কমিটিগুলো যথাযথভাবে কার্যকরী না হওয়ায় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া কমিটির বৈঠকে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের সুযোগ থাকলেও তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে নব নির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সরকার যথাসম্ভব যোগ্য ও মেধার ভিত্তিতে সংসদীয় কমিটি গঠন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সচেষ্ট হবে এটিই বিশিষ্টজনের অভিমত।

উপসংহার

সপ্তম জাতীয় সংসদের উল্লিখিত সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল বিরোধিতাপূর্ণ। সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের একক প্রাধান্য বজায় ছিল। ৯৯.৪২% সরকারি বিলের বিপরীতে বেসরকারি বিলের হার ছিল ০.৫৮%। সংসদীয় তদারকিমূলক কার্যক্রমেও বিরোধী দলের অধিকার সুরক্ষিত হয়নি। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা, জনগুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা, অধঘণ্টা আলোচনা এবং মুলতবি প্রস্তাবে বিরোধী দলের প্রাপ্ত নোটিশের অধিকাংশ স্পীকার কর্তৃক বাতিল হয়ে যায়। সংসদে প্রতিনিয়তই বিরোধী দলের একটি অভিযোগ ছিল যে, সংসদে তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। অপরদিকে সরকারের দাবী ছিল বিরোধী দলকে কথা বলার যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের বিতর্কের আচরণ ও বিষয়বস্তু থেকে বলা যায় যে, সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক ছিল পরস্পর বিদ্বেষপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্পীকারের অবস্থান ও নিরপেক্ষতার বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্পীকার সংসদের অভিভাবক হিসেবে নিজের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেনি। সংসদীয় কমিটির সভায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকলেও সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা এবং এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধী দলসমূহ সংসদকে নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে পারেনি। সরকারি দলের প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা এবং বিরোধী দলের বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতার সংস্কৃতিতে আবর্তিত সংসদ গঠনমূলক ভূমিকায় উপনীত হতে পারেনি। সংসদীয় কার্যক্রমকে ঘিরে সরকার ও বিরোধী দলের উল্লিখিত বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণে সপ্তম জাতীয় সংসদ অনেকাংশে কার্যকারিতা হারায়।

তথ্য নির্দেশিকা

১। *Far Eastern Economic Review*, April 11, 1996, p. 16.

২। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।

৩। Khan, Zillur R., *op.cit.*, p. 582.

৪। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।

৫। *সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন রিপোর্ট*, নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬।

৬। *Ibid*.

৭। *Far Eastern Economic Review*, July 4, 1996, p. 21.

৮। *Far Eastern Economic Review*, June 27, 1996, p. 18.

৯। Hakim, Md. Abdul, *op.cit.*, p. 94.

১০। Mannan, Md. Abdul, *op.cit.*, p. 156.

১১। Hasanuzzaman, Al Masud, *op.cit.*, p. 213.

১২। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

১৩। *Ibid*, pp. 47-48.

১৪। চৌধুরী, শরীফ আহমদ, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬): জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭১।

১৫। চৌধুরী, শরীফ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

১৭। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

১৯। অষ্টম সংসদের ২২-তম অধিবেশনের ০৪.০৫.২০০৬ কার্যদিবসের অধিবেশন পর্যবেক্ষণ।

২০। হাসানউজ্জামান (১৯৯২), *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকা: অক্ষর, পৃ. ৫৭-৫৮।

২১। *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, 4 April 1918.

২২। প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

২৩। পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

২৪। সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

২৫। প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

২৬। পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

২৭। সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

২৮। ফিরোজ, জালাল (২০০৩), *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ১১৪।

২৯। রেহমান, তারেক সামছুর (২০০২), *গণতন্ত্রের শত্রু-মিত্র: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, পৃ. ১৬৪।

৩০। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

৩১। মাসুম, আব্দুল লতিফ, "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র: বিএনপি শাসন আমল (১৯৯১-৯৬)", *The Jahangirnagar Review*, vol. ..., no. viii, part c, 1996-97, p. 80.

৩২। Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh*, England: Ashgate Publishing Limited, p. 192.

৩৩। *Ibid*, p. 192.

৩৪। *দৈনিক সংবাদ*, ৮ জুন ১৯৭৩।

৩৫। *Weekly Dhaka Post*, vol. 5, Issue 3, 12 May 2006.

৩৬। মনিরুজ্জামান, তালুকদার (২০০৩), *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা: শুভ প্রকাশন, পৃ. ৪৮।

৩৭। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

৩৮। *সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের ৩৭তম বৈঠকের সরকারি প্রতিবেদন*, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৯। অষ্টম সংসদের ২৩তম অধিবেশনের সমাপনী কার্যদিবসের পর্যবেক্ষণ।

৪০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি (২০০১ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত) পৃ, ৯৪-৯৫।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৮তম অধ্যায়ে সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পালনীয় বিধির ২৬৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সংসদের বৈঠক চলাকালে শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হয়েছে।

(১) কোনো সদস্য বক্তৃতাকালে তাহাকে উচ্ছৃঙ্খল উক্তি বা গোলমাল সৃষ্টি বা অন্য কোনোরূপ বিশৃঙ্খল আচরণ দ্বারা বাধা প্রদান করিবেন না;

(২) সভাপতি এবং বক্তৃতারত কোনো সদস্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া চলাচল করিবেন না;

(৩) সংসদে বক্তৃতা ব্যতিরেকে নীরবতা পালন করিবেন এবং

(৪) সংসদের কাজে বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবেন না এবং বক্তৃতা চলাকালে কোনো প্রকার টিকা-টিপ্পনী কাটিবেন না বা শিস্ দিবেন না।

২৭০চ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে, কোনো সদস্য বক্তৃতাকালে–

(১) রহিত করার প্রস্তাব ব্যতীত সংসদের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটাক্ষপাত করিবেন না;

(২) সংসদের পরিচালনা বা কার্যবাহ সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার করিবেন না;

(৩) কোনো আক্রমণাত্মক কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিবেন না;

(৪) দেশদ্রোহিতামূলক রাষ্ট্রবিরোধী বা মানহানিকর উক্তি করিবেন না এবং কোনো বিতর্কে অসৌজন্যমূলকভাবে কোনো সদস্যের উল্লেখ করিবেন না এবং সংসদে বিগর্হিত কোনো কথা বলার অনুমতি তাহাকে দেওয়া হইবে না।

৪১। রেহমান, তারেক সামসুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

৪২। *দৈনিক আমার দেশ*, ৬ এপ্রিল ২০০৫।

৪৩। উমর, বদরুদ্দীন (২০০৩), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র*, ঢাকা: সাহিত্যিকা, পৃ. ১৪৫।

৪৪। চৌধুরী, শরীফ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০।

৪৫। Mahajan, V. D. (1991), *Select Modern Government*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd., p. 111.

৪৬। *বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক*, ১২ অক্টোবর ১৯৭২।

৪৭। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি* (২০০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত), পৃ. ৯।

নিরপেক্ষভাবে সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালীর ১৪ বিধিতে স্পীকারকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিধি হচ্ছে–

১. "স্পীকার বৈঠকে শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান জানাইবেন।
২. স্পীকার শৃঙ্খলা ও ভব্যতা রক্ষা করিবেন এবং গ্যালারিতে গোলযোগ সৃষ্টি হইলে বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি গ্যালারি খালি করাইতে পারিবেন।
৩. স্পীকার সকল বৈধতার প্রশ্নে নিষ্পত্তি করিবেন।

স্পীকারের সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা স্পীকারের থাকিবে।"

৪৮। Mahajan, V. D., *op.cit.*, p. 288.

৪৯। ভূঁইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ (১৯৮৯), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা: রয়েল লাইব্রেরী, পৃ. ৮৩।

৫০। Kaul, M. N. Shakdher S. L. (2001), *Practice and Procedure of Parliament*, New Delhi: Loksabha Secretariat, p. 120.

৫১। Wilding, Norman and Laundy Philip (1961), *An Encyclopaedia of Parliament, Revised Edition*, London: Cassell and Company Ltd., p. 701.

৫২। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

৫৩। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (২০০১), *বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি*, পৃ. ১২৫-১২৬।

৫৪। Griffith, J. A. G and Ryle, Michael (1989), *Parliament: Functions, Practice and Procedures*, London: Sweet and Maxwell, p. 142.

৫৫। *প্রথম আলো*, ৩০ মে ২০০৬।

৫৬। Harun, Shamsul Huda (1984), *Parliamentary Behaviour in a Multinational State 1947-1958: Bangladesh Experience*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, p. 82.

৫৭। Shahidullah, Md., "Legislative Committees and Committee System in Bangladesh", *Asian Studies*, vol. 20, June 2001, p. 41.

৫৮। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

৫৯। *বাংলাদেশে সুশাসন*, "আইনগত ও বিচারিক প্রেক্ষাপট", বাংলাদেশ আইন সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ, ৩০ অক্টোবর ২০০২।

৬০। Barnhart, Gordon (1999), Parliamentary Committees: Enhancing Democratic Governance, *A Report of Commonealth Parliamentary Association Study Group on Parliamentary Committees and Committee System*, London: Cavendish Publishing Limited, p. 8.

৬১। Seminar on "Parliamentary Oversight and Government Accountability in Bangladesh: The Role of Standing Committees on Ministries", Organized by the SPD Project, Dhaka, 4 April 2004, SPD News Letter, March 2004, p. 6.

৬২। SPD (Strengthening Parliamentary Democracy) Project, Dhaka, Bangladesh, 4 April 2004 ও 31 July 2005 এবং Parliamentary Centre and the Economic Development Institute of the World Bank, Montebello, Canada, July 20-30, 1997 এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারগুলিতে সংসদীয় কমিটিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, এমন একটি সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যেখানে নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলগুলো বাস্তবতার নিরিখে সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নিবে। বিশেষ করে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটি গঠন করতে হবে। দাবী অনুযায়ী কমিটিতে আলোচিত সুপারিশগুলির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যপ্রণালী বিধির সংশোধন হবে। কমিটির সভাগুলি সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে, বেসরকারী উদ্যোগে নয়। স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের মর্যাদা মন্ত্রীর সমপর্যায়ে নিয়ে আসা। বিভিন্ন স্থায়ী

কমিটির চেয়ারম্যানগণ যাতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সচিব পর্যায়ে নিজেদের পছন্দমত নিয়োগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৬৩। David, Butcher (2005), "Parliamentary Committees: New-Zealand Experience", Paper Presented at the International Workshop on "Parliamentary Committees in Westminister System: Lessons for Bangladesh", Organized by the SPD Project, Dhaka, 31 July, SPD Newsletter, no. 18, July-December, p. 3.

সপ্তম অধ্যায়

সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক: আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রায় এর পভাব

আলোচ্য গবেষণা কর্মটিতে গবেষনার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগণের মতামত জরিপের মাধ্যমে গবেষণার তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মতামত জরিপে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যাবলী গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সাধারণ তথ্যাবলী: প্রশ্নমালার আলোকে নির্বাচিত ১০০ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে Purposive Random Sampling Method ব্যবহার করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মতামত নির্বাচনে লিঙ্গ সমতা বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিত্ব, গ্রাম ও শহরের সমতা বিধান, বিভিন্ন পেশা ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

জরিপে অংশগ্রহণকারী ১০০ জন উত্তরদাতাদের বয়সসীমা ১৮-৭৭ বছর পর্যন্ত। টেবিল ১ অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৬% উত্তরদাতা ছিলেন ২৮-৩৭ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে। এর পরেই ছিল ৫৮-৬৭ বছর বয়স শ্রেণীর ২২%। অপরদিকে সবচেয়ে কমসংখ্যক অর্থাৎ ৬% উত্তরদাতা ছিলেন ৬৮-৭৭ বছর বয়স শ্রেণীর।

টেবিল: ৭.১

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

বয়সসীমা	উত্তরদাতার শতকরা হার
১৮-২৭	৭%
২৮-৩৭	২৬%
৩৮-৪৭	১৯%
৪৮-৫৭	২০%
৫৮-৬৭	২২%
৬৮-৭৭	৬%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

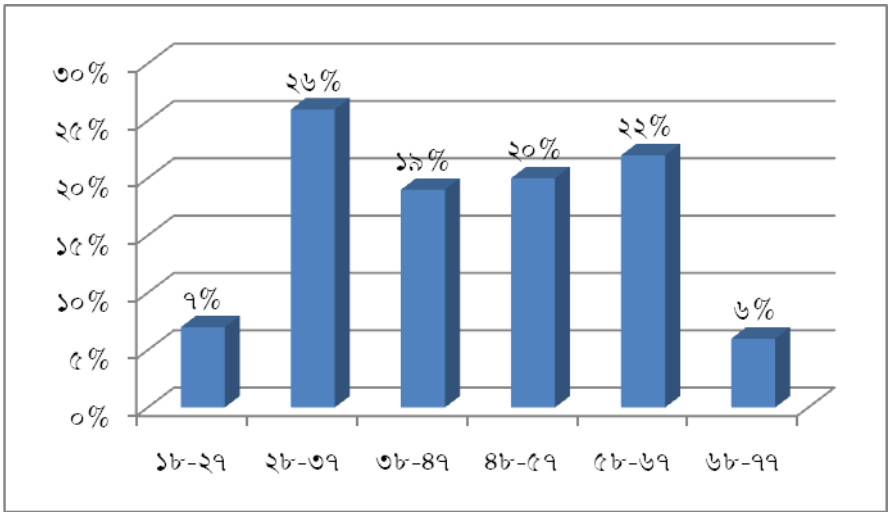

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি. এর নিম্ন স্তর থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর পর্যন্ত যার শতকরা হার ৩৩%। এর পরেই রয়েছে ২৯% উত্তরদাতা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি. এর নিচে। ২২% উত্তরদাতা রয়েছেন স্নাতক পর্যায়ের। ১০% রয়েছেন এইচ.এস.সি. এবং ৬% উত্তরদাতা এস.এস.সি. স্তরের।

টেবিল: ৭.২

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্তর	উত্তরদাতার শতকরা হার
এস.এস.সি. এর নিম্নে	২৯%
এস.এস.সি.	৬%
এইচ.এস.সি.	১০%
স্নাতক	২২%
স্নাতকোত্তর	৩৩%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ২

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

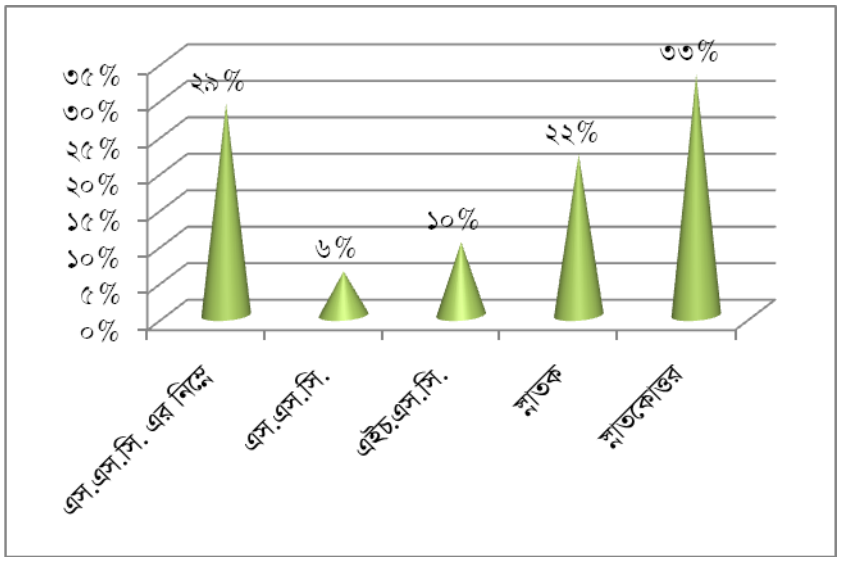

উত্তরদাতাদের ধর্ম

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ধর্মীয় ভিন্নতা রয়েছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা ইসলাম ধর্মাবলম্বী যাদের শতকরা হার ৮২%। এর পরে সর্বনিম্ন পর্যায়ের উত্তরদাতা যৌথভাবে ৫ শতাংশ হারে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক। খ্রিস্টান ধর্মের অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতার সংখ্যা ৮%।

টেবিল: ৭.৩

উত্তরদাতাদের ধর্ম

ধর্ম	উত্তরদাতার শতকরা হার
ইসলাম	৮২%
হিন্দু	৫%
খ্রিস্টান	৮%
বৌদ্ধ	৫%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৩

উত্তরদাতাদের ধর্ম

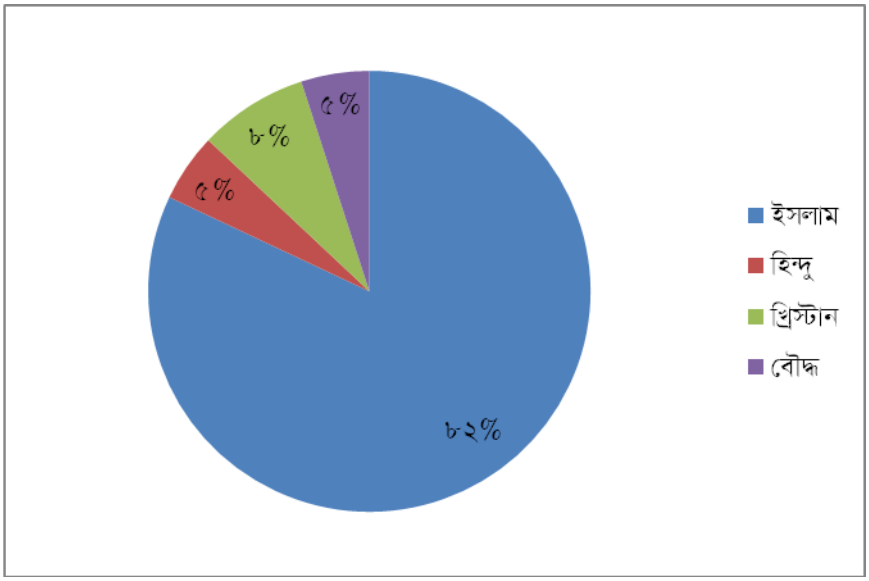

উত্তরদাতাদের পেশা

জরিপে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল যে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির জনগণ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা। সে প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পেশাজীবীদের জরিপের আওতায় নিয়ে আসা হয়। পেশাজীবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ২২% অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সংখ্যাই বেশী। তৃণমূল পর্যায়ে যেসব শ্রমজীবী মানুষ রয়েছে তাদের সংখ্যা ১৯%। অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত এই সমস্ত পেশায় রয়েছেন রিক্সা ড্রাইভার, দিনমজুর, কৃষক, সব্জি বিক্রেতা, হকার ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ। চাকুরীজীবীদের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের চাকুরীজীবী ১৬ শতাংশ। শিক্ষক, আইনজীবী ও সাংবাদিক রয়েছে ১৯ শতাংশ। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১৪ শতাংশ এবং রাজনীতিবিদ আছেন ১০%।

টেবিল: ৭.৪

উত্তরদাতাদের পেশা

পেশার ধরন	উত্তরদাতার শতকরা হার
শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক	১৯%
ব্যবসায়ী	২২%
রাজনীতিবিদ	১০%
সরকারি ও বেসরকারি চাকুরীজীবী	১৬%
ছাত্রছাত্রী	১৪%
অন্যান্য	১৯%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৪

উত্তরদাতাদের পেশা

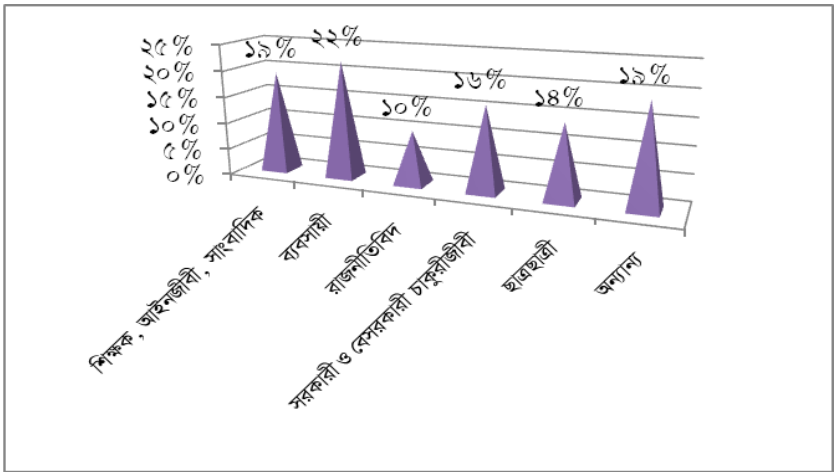

টেবিল: ৭.৫

সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও বিরোধপূর্ণ

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৪%
না	১৪%
মন্তব্য নাই	১২%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৫

সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও বিরোধপূর্ণ

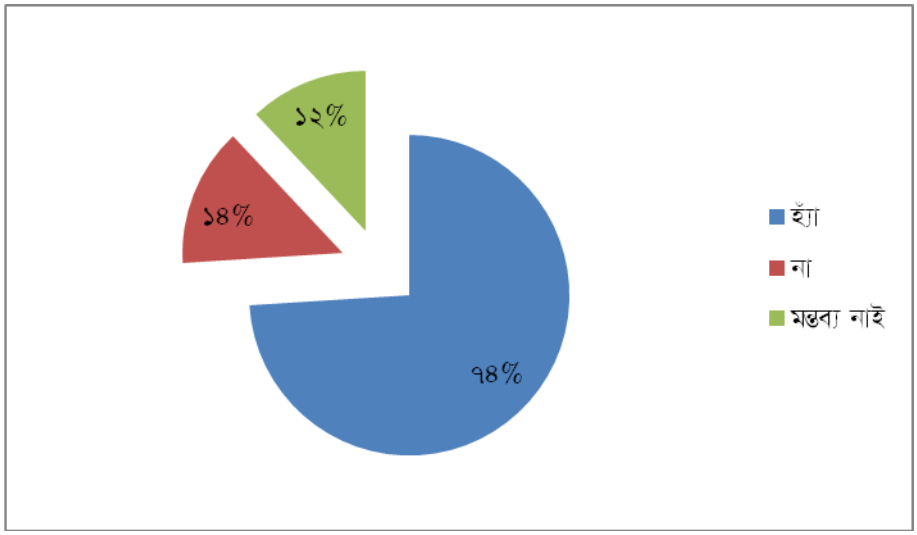

জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও বিরোধপূর্ণ এমন প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ ৭৪% উত্তরদাতা মনে করেন সংসদে উভয় দলের সম্পর্ক দ্বন্দ্ব সংঘাতময়। ১৪% উত্তরদাতা উপরোক্ত প্রশের উত্তরে না সূচক মন্তব্য করেন। ১২% উত্তরদাতা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নাই।

টেবিল: ৭.৬

সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সহনশীলতাপূর্ণ নয়

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৫%
না	১০%
মন্তব্য নাই	১৫%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৬

সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সহনশীলপূর্ণ নয়

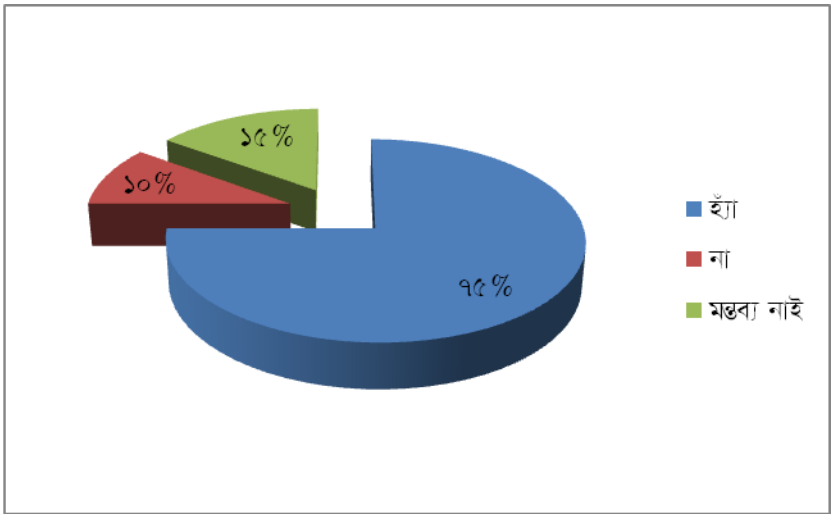

এ প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৭৫% উত্তরদাতা মনে করেন সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক মোটেও সহনশীলতাপূর্ণ নয়। ১০% উত্তরদাতা মনে করেন উভয় দলের সম্পর্ক সহনশীলতাপূর্ণ। এই প্রশ্নের উত্তরে ১৫% উত্তরদাতা কোন প্রকার মন্তব্য করেনি। উত্তরদাতাদের অভিমত দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক সহনশীল হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

টেবিল: ৭.৭

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর দলীয় মতাদর্শের প্রভাব রয়েছে

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৫%
না	১০%
মন্তব্য নাই	১৫%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৭

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর দলীয় মতাদর্শের প্রভাব রয়েছে

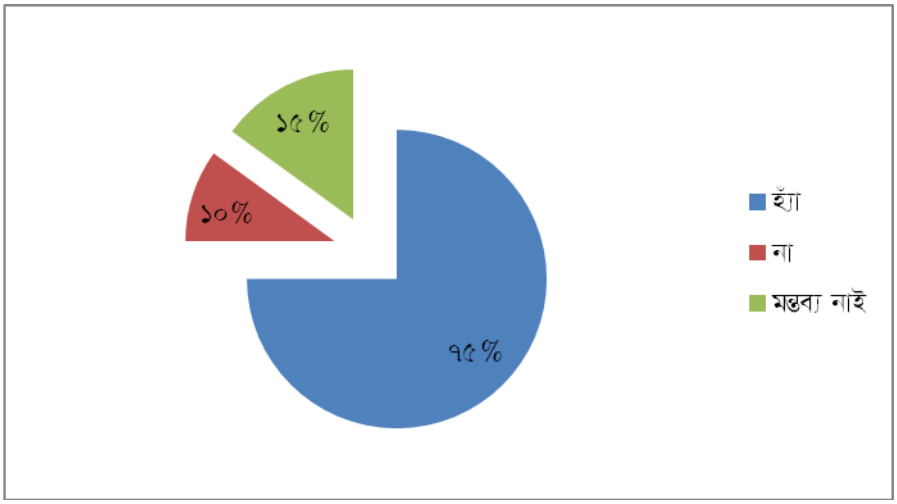

জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর দলীয় মতাদর্শ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৫% উত্তরদাতা মনে করেন। দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শকেন্দ্রিক সুদৃঢ় অবস্থান থাকার কারণে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক দলীয় মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। কট্টরপন্থী দলীয় মতাদর্শ পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্কের সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। অপরদিকে ১০% উত্তরদাতা পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দলীয় মতাদর্শ কোন বাঁধা নয় বলে মনে করেন। তাদের মতে রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। এক্ষেত্রে দলীয় মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জনগণের কল্যাণে ব্রতী হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। ১৫% উত্তরদাতা উপরোক্ত প্রশ্নের উপর কোন মন্তব্য করেনি।

টেবিল: ৭.৮

দলীয় কার্যক্রমে গণতন্ত্রের চর্চা

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	১৯%
না	৭২%
মন্তব্য নাই	৯%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৮

দলীয় কার্যক্রমে গণতন্ত্রের চর্চা

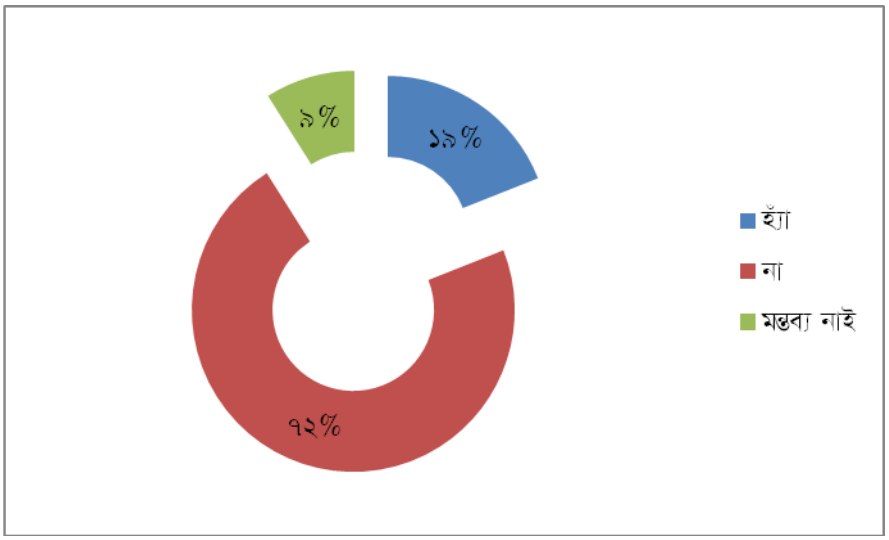

রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ দলীয় কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় কিনা? এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে ৭২% উত্তরদাতা না বোধক উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন দলগুলির দলীয় কার্যক্রমে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। আর সে কারণেই একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরি হয়নি। অপরদিকে ১৯% উত্তরদাতা মনে করে রাজনৈতিক দলগুলির দলীয় কার্যক্রমে গণতন্ত্রের চর্চা রয়েছে। উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ৯% উত্তরদাতা কোনরূপ মন্তব্য করেননি।

টেবিল: ৭.৯

সরকার ও বিরোধী দলের যথাযথ ভূমিকার মাধ্যমে সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে পারে

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৪%
না	৫%
মন্তব্য নাই	২১%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৯

সরকার ও বিরোধী দলের যথাযথ ভূমিকার মাধ্যমে সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে পারে

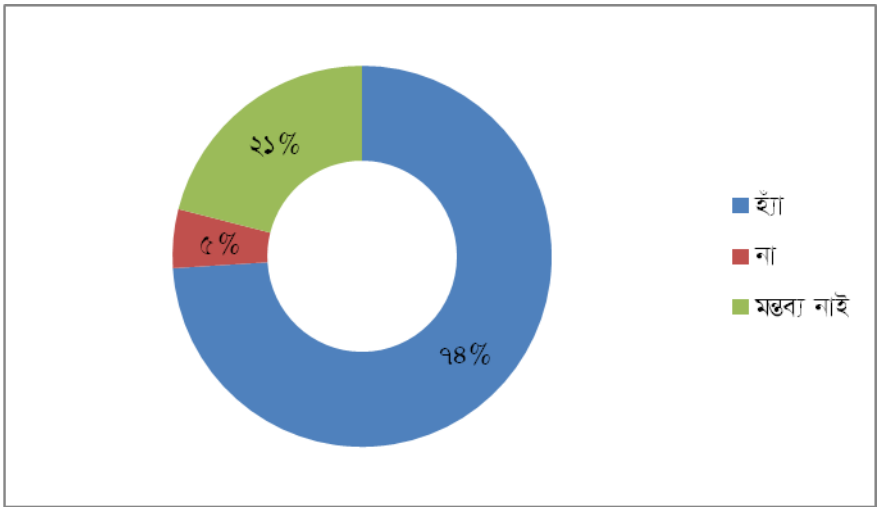

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ৭৪% অংশগ্রহণকারী মনে করেন যে, সরকার ও বিরোধী দল যদি সংসদে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে তাহলে জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতা অনেকাংশেই নিশ্চিত হতে পারে। শতকরা ৫ জনের অভিমত শুধু উভয় দলের যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে পারে না। ২১% উত্তরদাতা অবশ্য এ ব্যাপার কোন মন্তব্য হতে বিরত থাকেন।

টেবিল: ৭.১০

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৯১%
না	৬%
মন্তব্য নাই	৩%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১০

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি

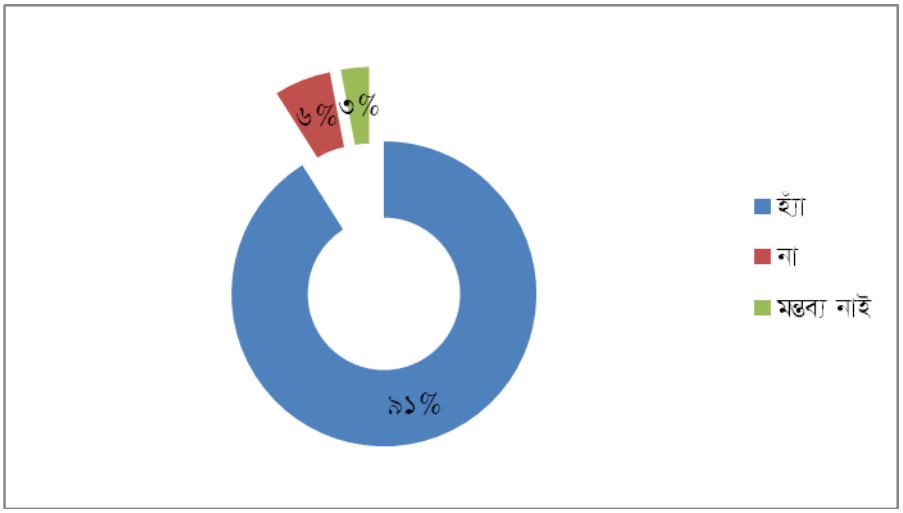

দেশব্যাপী অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজমান থাকলে দেশের জনগণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই প্রশ্নের জবাবে জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ জনগণ অর্থাৎ ৯১% উত্তরদাতা মনে করেন যে, রাজনৈতিক পরিবেশ যদি অস্থিতিশীল থাকে তাহলে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে কেবল ৬% উত্তরদাতা মনে করেন এ ব্যাপারে তাদের কোন অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় না। এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে ৩% উত্তরদাতা কোনরূপ মন্তব্য করেননি।

একটি দেশের উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের প্রয়োজন। জনগণ যাতে নির্বিঘ্নে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতার অংশীদারত্বের দ্বন্দ্ব সংঘাতের কারণে যদি জনজীবনে ভীতির আশংকা দেখা দেয় তাহলে অর্থনৈতিক লেনদেনে দরপতন ঘটে বিনিয়োগকারীরা অর্থনৈতিক বিনিয়োগে অস্বস্তি প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে শুধু

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই নয় সমাজের অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণীও এই ক্ষতির অংশীদার বলে মনে করেন, জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণ।

টেবিল: ৭.১১

হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার করা উচিত

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৯৭%
না	৩%
মন্তব্য নাই	০%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১১

হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার করা উচিত

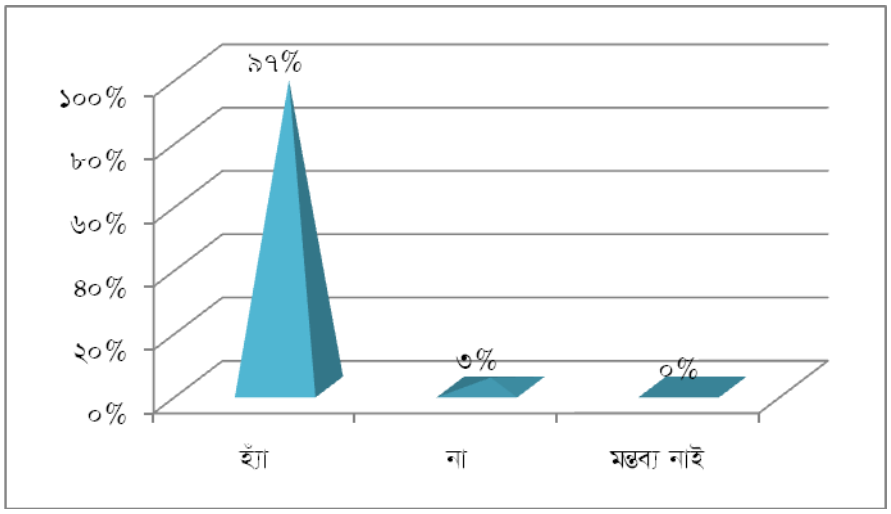

জনগণের আশা আকাঙ্খার পরিপন্থী কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী শাসকের বিরুদ্ধে সংখুব্ধ হয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল যখন দেশব্যাপী কিংবা আংশিক হরতাল, অবরোধ আহ্বান করে, তখন তা গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু হরতাল অবরোধ কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার মাধ্যমে জনজীবনে যখন অরাজকতা, সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম নেয়, তখন এইরূপ গণতান্ত্রিক অধিকার জনসমর্থন হারায়। উপরোক্ত টেবিল ও গ্রাফটি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, জরিপে অংশ নেওয়া ৯৭% উত্তরদাতা হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উত্তরদাতাদের অভিমত হচ্ছে সরকার ও বিরোধী পক্ষকে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে জনগণের অধিকার সমুন্নত রেখে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে

হবে। মাত্র ৩% উত্তরদাতা অবশ্য এ বিষয়ে না বোধক উত্তর প্রদান করে হরতাল, অবরোধকে সমর্থন করেছেন। এই প্রশ্নের পক্ষে বিপক্ষে উত্তরদাতাদের শতভাগ অংশগ্রহণ ছিল। মন্তব্য বিহীন কোন উত্তরদাতা খুজে পাওয়া যায়নি।

টেবিল: ৭.১২

হরতাল অবরোধের বিকল্প হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও ও মানববন্ধন সমর্থন

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৮২%
না	১৪%
মন্তব্য নাই	৪%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১২

হরতাল অবরোধের বিকল্প হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও ও মানববন্ধন সমর্থন

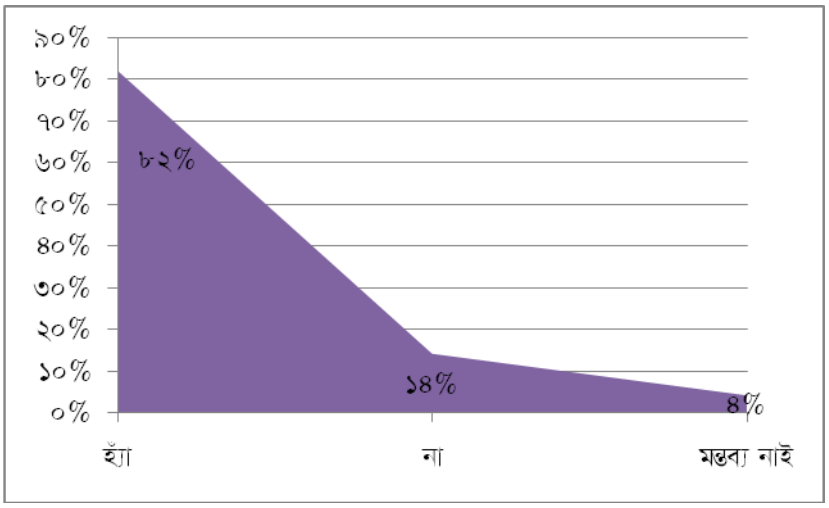

হরতাল, অবরোধ একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হলেও এর জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে হরতাল, অবরোধের বিকল্প কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সচেতন নাগরিকদের মধ্যে একটি সহমত সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে হরতাল, অবরোধের বিকল্প হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করা যেতে পারে। গবেষণা জরিপের এইরূপ উত্তরদাতাদের সংখ্যা শতকরা ৮২%। অপরদিকে হরতাল, অবরোধের বিকল্প কর্মসূচিকে সমর্থন করেননি ১৪% উত্তরদাতা। তারা হরতাল, অবরোধের পক্ষেই সমর্থন জানান এবং এটি গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মনে করেন। উপরোক্ত প্রশ্নের আলোকে কয়েকজন উত্তরদাতা হরতাল, অবরোধ কিংবা এর

বিকল্প কর্মসূচিগুলির কোনটাই সমর্থন করেননি। জরিপে এ সম্পর্কিত প্রশ্নে ৪% উত্তরদাতা কোন মন্তব্য না করে নিরব থেকেছেন।

টেবিল: ৭.১৩

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৯৪%
না	৩%
মন্তব্য নাই	৩%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৩

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন

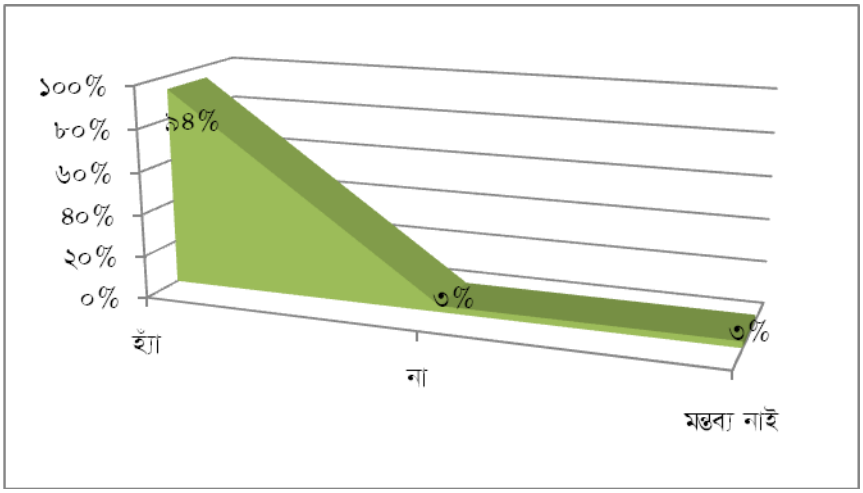

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈরীতামূলক প্রকৃতির কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দল নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসন করে দেশ পরিচালনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করবে বলে জরিপে অংশ নেওয়া ৯৪% উত্তরদাতা মনে করেন। ৩% উত্তরদাতা এ প্রশ্নের জবাবে না বোধক উত্তর দিয়েছেন। তাদের মতে দেশ পরিচালনায় দলের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ৩% উত্তরদাতা কোন মন্তব্য করেননি।

টেবিল: ৭.১৪

বিরোধী দল তাদের কর্মসূচি সফল করার জন্য সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন করতে পারে

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৬৭%
না	১৭%
মন্তব্য নাই	১৬%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৪

বিরোধী দল তাদের কর্মসূচি সফল করার জন্য সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন করতে পারে

জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সংসদ বর্জন বিষয়টি সংসদীয় কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিশেষ করে ১৯৯১ থেকে ২০০১ সময়কালে সংসদে কোন বিরোধী দলই সংসদীয় কার্যক্রমে পুরোপুরিভাবে অংশ নেয়নি। সংসদীয় কার্যদিবসে তাদের ব্যাপক অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, তারা সংসদকে কার্যকর করতে চান না। সংসদে বিরোধী দল বরাবরই সংসদের বাইরে আন্দোলন সংগ্রাম করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে অভ্যস্ত এবং মনে হয় এ ব্যাপারে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বিরোধী দল সংসদে যোগ দিয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। এটিই জনগণের আকাঙ্খা। বিরোধী দল সংসদে গঠনমূলক বিরোধীতা বজায় রেখে সংসদের বাইরেও সরকার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে পারে বলে জরিপে অংশ নেওয়া অধিকাংশ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৬৭% উত্তরদাতা তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। বিরোধী দল কর্তৃক সংসদের ভিতরে বাইরের আন্দোলন সংগ্রামকে সমর্থন করেননি ১৭% উত্তরদাতা। শতকরা ১৬% উত্তরদাতা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে কোনরূপ মন্তব্য প্রদান করেনি।

টেবিল: ৭.১৫

রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৫%
না	৫%
মন্তব্য নাই	২০%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৫

রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে

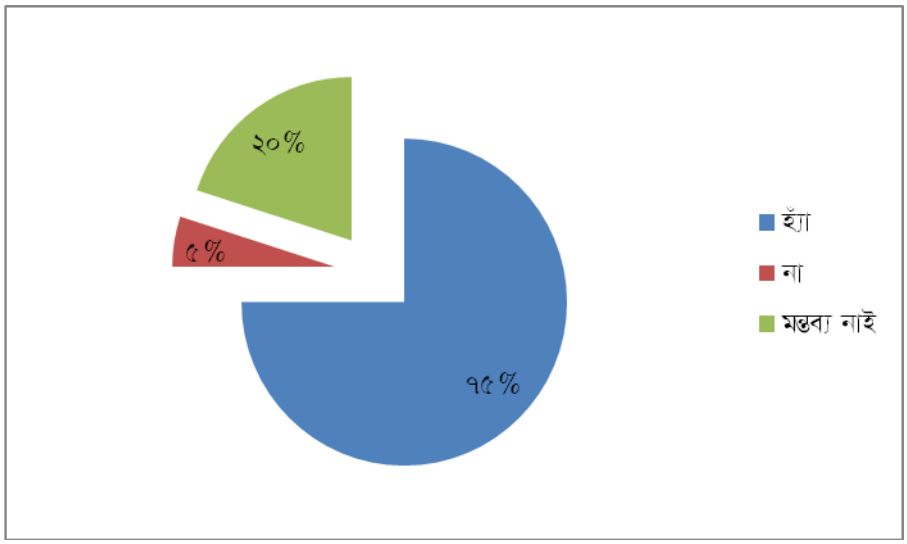

সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান নিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে বলে ৭৫% উত্তরদাতা মনে করেন। রাজনৈতিক দলগুলির দলীয় কার্যক্রম গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার অভাব রয়েছে। অথচ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রধান বাহক রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি রাজনীতি সচেতন জনগোষ্ঠী বিনির্মানে ভূমিকা পালন করবে বলে উত্তরদাতারা মনে করেন। জরিপে অংশ নেওয়া ৫% উত্তরদাতা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবনতির ব্যাপারে না সূচক মন্তব্য করেছেন। তাদের ধারণা রাজনীতির গতি প্রবাহ সঠিক ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। শতকরা ২০% উত্তরদাতা এ প্রশ্নের জবাবে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন।

টেবিল: ৭.১৬

সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে পেশাগত বিষয়ে সমস্যা

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৮৪%
না	১৪%
মন্তব্য নাই	২%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৬

সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে পেশাগত বিষয়ে সমস্যা

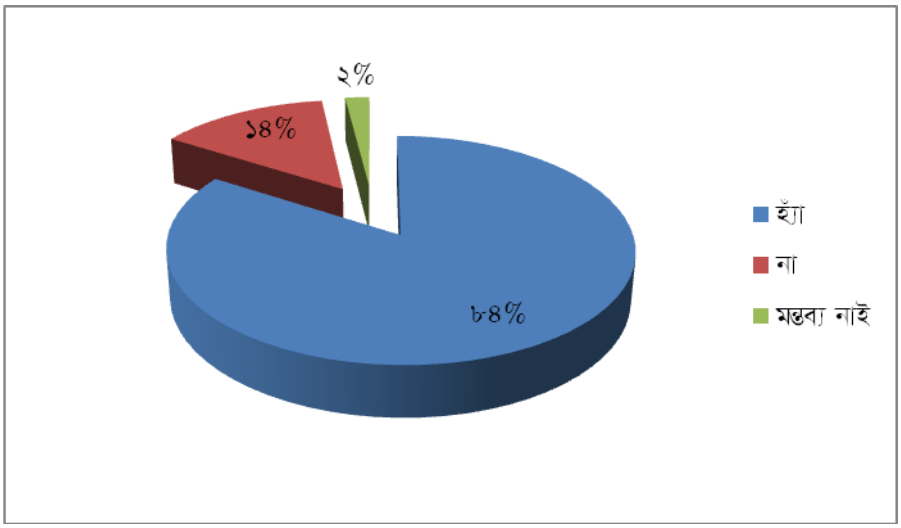

সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সমাজের পেশাজীবী শ্রেণী, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পেশাজীবী শ্রেণীর জনগণ নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন জরিপে অংশ নেওয়া শতকরা ৮৪% অংশগ্রহণকারী। উত্তরদাতারা মনে করেন, সরকার ও বিরোধী দলের সংঘাতমূলক রাজনৈতিক কর্মসূচি তাদের পেশাগত জীবনকে দূর্বিসহ করে তুলেছে। এক্ষেত্রে চাকুরীজীবীদের সময়মত কর্মস্লে না পৌঁছানোর পরিপ্রেক্ষিতে কর্মের অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়া। কর্মস্থলে যাতায়াতের অসুবিধা এবং অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি। একইভাবে তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষুদ্র পেশাজীবীদের দৈনিক আয়ের উৎসেও চরম ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। উত্তরদাতাদের একাংশ অর্থাৎ ১৪% উত্তরদাতা মনে করেন সরকার ও বিরোধা দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তাদের পেশাগত জীবনে কোন সমস্যা নেই। শতকরা ২% উত্তরদাতা অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তরে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

টেবিল: ৭.১৭

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে ব্যবসার ক্ষতি

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৮১%
না	৭%
মন্তব্য নাই	১২%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৭

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে ব্যবসার ক্ষতি

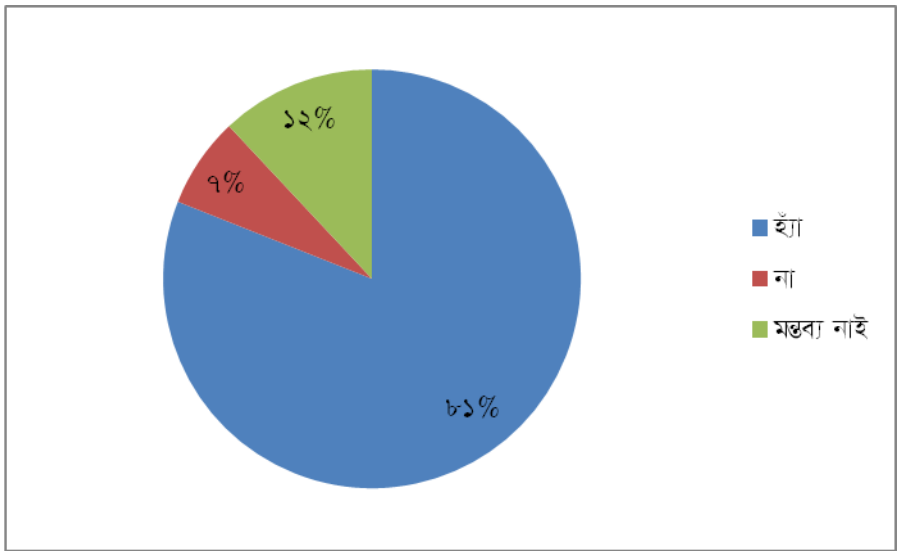

অধিকাংশ উত্তরদাতা হ্যাঁ বোধক মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ ৮১% উত্তরদাতা মনে করেন, সরকার ও বিরোধী দলের পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এইরূপ অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ মোটেও ব্যবসা বান্ধব নয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় চরম অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীগণ মনে করেন রাজনৈতিক অরাজকতার মাধ্যমে জনজীবনে বিপর্যস্ত হলে ব্যবসায় ক্রেতা সংকট, পরিবহন সংকট, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থাৎ ব্যাংক, বীমা কোম্পানিতে আর্থিক লেনদেনের সংকট দেখা দেয়। এই সমস্ত সংকটের কারণে পণ্যের মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ হয় দেশের অর্থনীতি। শতকরা ৭% উত্তরদাতা অবশ্য ব্যবসায়িক ক্ষতির কথা স্বীকার করেননি। এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করেননি ১২% উত্তরদাতা।

টেবিল: ৭.১৮

রাজনৈতিক সহিংসতা থাকলে নাগরিকরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে না

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৬%
না	৯৪%
মন্তব্য নাই	০%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৮

রাজনৈতিক সহিংসতা থাকলে নাগরিকরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে না

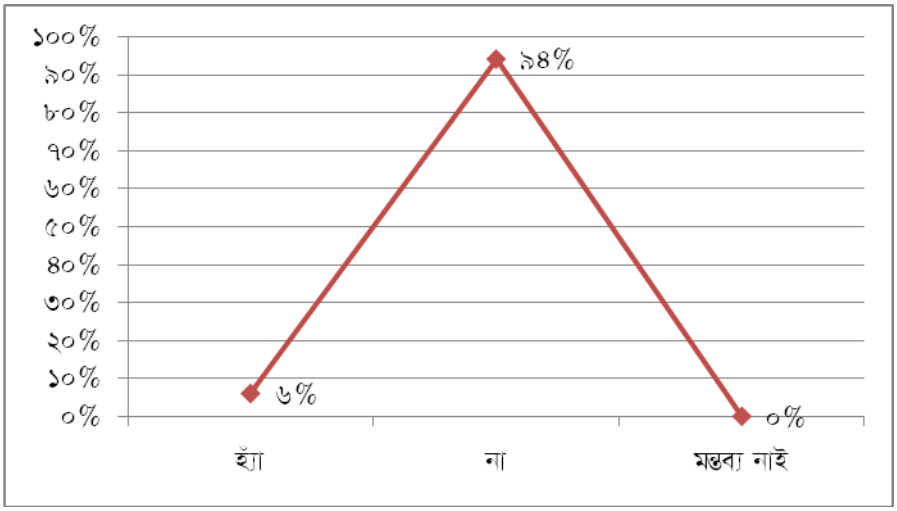

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় অসংখ্য জনগণ হতাহতের স্বীকার হয়েছেন। সরকার বিরোধী আন্দোলন কিংবা বিরোধীদল দমনে নানাবিধ কর্মসূচীর কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বারবার। সে কারণেই এই সমস্ত কর্মসূচী চলাকালে জনগণের স্বাভাবিক চলাচল বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। প্রয়োজনে জনগণ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে না। উপরোক্ত প্রশ্নের আলোকে ৯৪% উত্তরদাতাই এরূপ না বোধক মন্তব্য করেছেন। মাত্র ৬% উত্তরদাতা সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচী চলাকালে তাদের যাতায়াতে কোন অসুবিধা নেই বলে মতামত দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। এখানে কোন উত্তরদাতাই কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেননি।

টেবিল: ৭.১৯

শহরকেন্দ্রিক বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারণে দু:চিন্তা

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৮৩%
না	১৪%
মন্তব্য নাই	৩%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৯

শহর কেন্দ্রিক বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারণে দু:চিন্তা

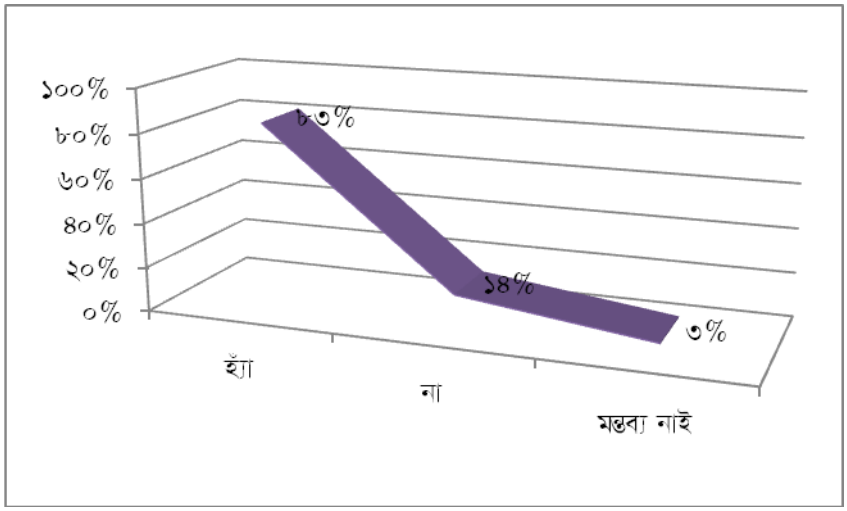

সরকার ও বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত শহর কেন্দ্রিক বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মসূচী। বিশেষ করে উভয় দলের একই স্থানে কর্মসূচীর ঘোষণা নাগরিক জীবনকে দু:চিন্তাগ্রস্থ করে তুলে। এই ধারণা রয়েছে শতকরা ৮৩% উত্তরদাতার মধ্যে। উত্তরদাতারা আরও মনে করেন যে, এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচীর কারণে অতিরিক্ত পুলিশী তৎপরতার কারণে নিরীহ ব্যক্তিবর্গ হয়রানির স্বীকার হন। পুলিশ কর্তৃক গণগ্রেফতার এবং বিনা বিচারে জেল জরিমানার বিষয়টি জনগণকে অপরিসীম আতংক এবং দু:চিন্তায় পতিত করে থাকে। জরিপে অংশ নেওয়া নাগরিকদের একাংশ অর্থাৎ ১৪% অংশগ্রহণকারী মনে করেন বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারণে তাদের মধ্যে কোন দু:চিন্তা নেই। ৩% উত্তরদাতা এই প্রশ্নের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি।

টেবিল: ৭.২০

হরতাল অবরোধ চলাকালে নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	১৩%
না	৮৩%
মন্তব্য নাই	৪%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ২০

হরতাল অবরোধ চলাকালে নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ

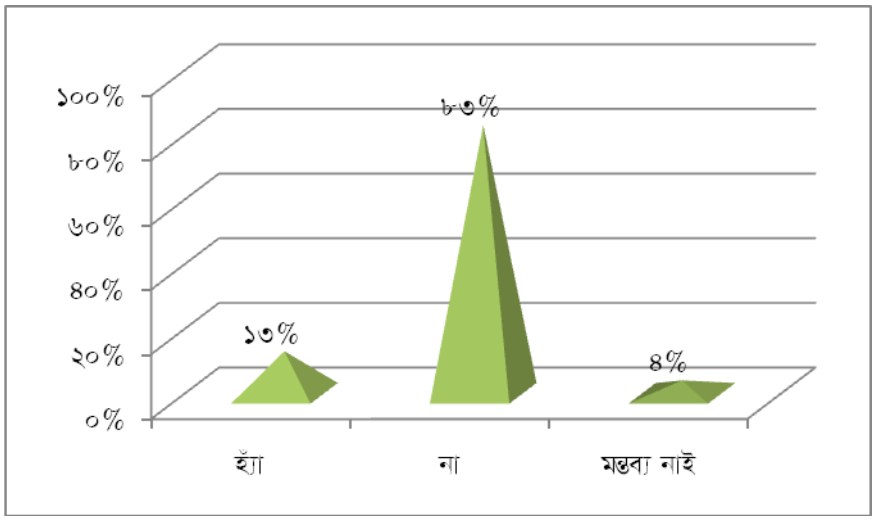

বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত হরতাল অবরোধ কর্মসূচী বিশেষ করে ৪৮ ও ৭২ ঘন্টা ব্যাপী কর্মসূচী জন-জীবনকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। এই সময়ে হাসপাতালগামী অসুস্থ রোগী, পরিবহন সংকটে ও রাস্তায় যাতায়াতকালে হামলার স্বীকার হন। জরুরী রোগী বহনকারী এম্বুলেন্স সার্ভিস ও এই হামলা থেকে রেহাই পায়নি। এই প্রেক্ষাপটে জরিপে অংশ নেওয়া ৮৩% উত্তরদাতাই না বোধক উত্তর প্রদান করেছেন। উত্তরদাতাদের অভিমত এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচী চলাকালে হাসপাতালে ডাক্তারের উপস্থিতি কম থাকায় চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হয়। এর ফলে অধিকাংশ জনগণ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হন। ১৩% উত্তরদাতা হরতাল অবরোধ চলাকালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। শতকরা ৪% উত্তরদাতা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন।

টেবিল: ৭.২১

হরতাল অবরোধ চলাকালে জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৮৭%
না	১১%
মন্তব্য নাই	২%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ২১

হরতাল অবরোধ চলাকালে জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা

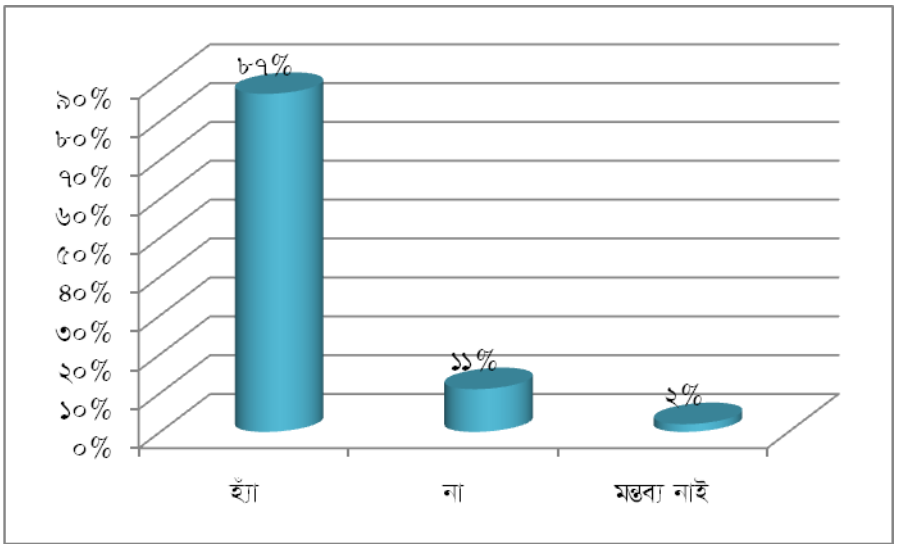

উপরোক্ত টেবিলে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৮৭% উত্তরদাতা মনে করেন যে, ঘনঘন হরতাল অবরোধ কর্মসূচীতে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। হরতাল পূর্ববতী সময়ে পুলিশ জনশৃঙ্খলার নামে কিংবা হরতালকারী পক্ষ জানমালের ক্ষতিসাধন করতে পারে। এই অনুমান নির্ভরতা থেকে গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করে থাকে। পুলিশ কর্তৃক এই ধরনের গ্রেফতার অভিযান জনগণের মধ্যে নিরপত্তাহীনতা দেখা দেয়। মতামত প্রদানকারীরা আরও মন্তব্য করেন যে, হরতাল অবরোধকে কেন্দ্র করে পুলিশী নির্যাতনের পাশাপাশি হরতাল আহ্বানকারী দলীয় নেতাকর্মী কর্তৃক সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি ভাংচুরের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষতিসাধন এবং জনগণের উপর মারমুখী আচরণ লক্ষ্য করা যায়। জনমত জরিপে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। ১০০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে নিম্ন আয়ের পেশাজীবী শ্রেণীর একাংশ অভিযোগ করেছেন হরতাল অবরোধবিহীন সময়েও পুলিশী নির্যাতনের কথা। উত্তরদাতাদের অভিমত পুলিশ কর্তৃক এই নির্যাতন তাদের যাপিত জীবনে ছিল এবং ভবিষ্যতেও এই নির্যাতন হয়তো যে কোন সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পুলিশী নির্যাতনের স্বরূপ

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উত্তরদাতারা বলেছেন, দিন-রাত্রির যে কোন সময় পুলিশ তাদের চলাচলের পথ রুদ্ধ করেছে এবং নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য বহনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে তাৎক্ষণিক অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে অনেকে অর্থের বিনিময়ে এ ধরনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। উত্তরদাতারা বলেছেন, পুলিশ জোর-জবরদস্তি অবৈধ মাদকের প্যাকেট তাদের শার্ট কিংবা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে এই অভিযোগ দায়ের করত যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠত। গবেষণা জরিপে উত্তরদাতাদের শতকরা ১১ ভাগ হরতাল অবরোধে ও নিজেদেরকে নিরাপত্তাহীন মনে করেন না। তাদের যুক্তি গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখার জন্য এ ধরনের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ২% উত্তরদাতা এই প্রশ্নের উত্তরে কোনরূপ মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

টেবিল: ৭.২২

সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দলের ভূমিকার প্রয়োজন

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৮০%
না	১১%
মন্তব্য নাই	৯%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ২২

সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দলের ভূমিকার প্রয়োজন

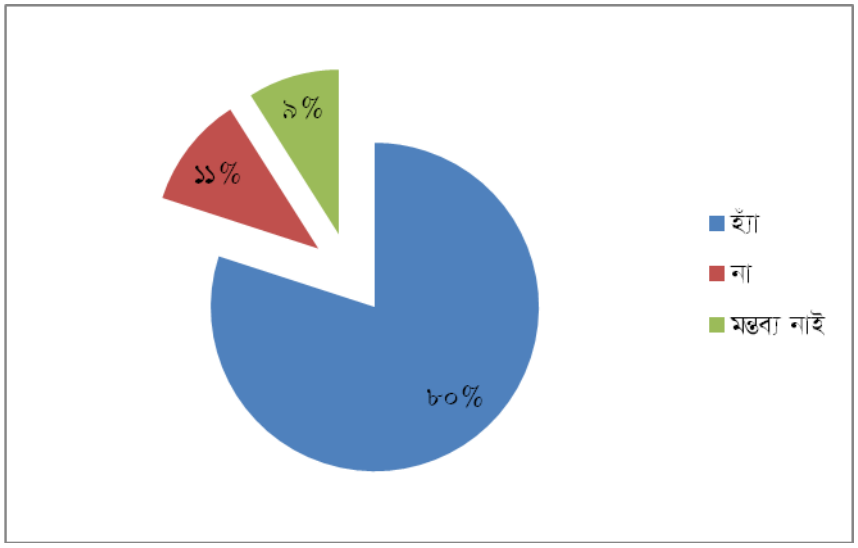

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সংসদের জবাবদিহিতা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সংসদ কেন্দ্রিক জবাবদিহিতার প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারি দলের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সরকারি

দলের দায়িত্বশীল আচরণ বিরোধী দলকে প্রভাবিত করতে পারে গবেষণা জরিপে ৮০% উত্তরদাতা মনে করেন সংসদে জবাবদিহিতার প্রশ্নে সরকারি দলকে বিশেষ ভূমিকা পালন করা উচিৎ। সংসদ পরিচালনায় স্পীকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বরাবরই স্পীকার সরকারী দল থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকে। সুতরাং বিরোধী দল যাতে সংসদে নির্ধারিত সময় কথা বলতে পারে স্পীকার সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে পারেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অভিযোগ রয়েছে যে, সরকার সংসদে তাদের কথা বলতে দেয়নি। অপরদিকে জরিপে অংশ নেওয়া ১১% উত্তরদাতা না বোধক মতামত প্রদান করেছেন। তারা মনে করেন, সংসদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দল উভয়েই একযোগে কাজ করা উচিত। এ ব্যাপারে সরকারের একার পক্ষে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। জবাবদিহিতার প্রশ্নে বিরোধী দলকেও দায়িত্বশীল হয়ে নানাবিধ অজুহাতকে অতিক্রম করে সংসদীয় কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখা। শতকরা ৯% উত্তরদাতা অবশ্য এ প্রশ্নের জবাবে কোন মন্তব্য করেননি।

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অস্থিতিশীল সম্পর্কের কারণে সমাজের বিভিন্ন পেশার জনগণ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সেই কার্যকারণের সন্ধানে জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে আরও কিছু প্রশ্ন করা হয়। সেই প্রশ্নের আলোকে বেশ কিছু মতামত উঠে এসেছে। যেমন, কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যখনই অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয় তখন উৎপাদিত কৃষি পণ্য ক্রয় বিষয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কৃষি পণ্যের হঠাৎ সংকট এবং দাম বৃদ্ধিজনিত কারণে ক্রেতাগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মজুতের ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক উৎপাদিত পণ্য স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে থাকে এবং কিছু পণ্য কাচামাল হওয়াতে নষ্ট হয়ে যায়।

উত্তরদাতারা বলেছেন ফসল উৎপাদনের মৌসুমে যদি দীর্ঘ মেয়াদী হরতাল অবরোধ চলে তাহলে কৃষি উপকরণ সহজলভ্য এবং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। এ সময়ে সার, বীজ এবং কীটনাশকের অভাবে জমিতে বীজ বপনে সময়ের হেরফের হয় এবং কৃষক জমি পতিত রাখতে বাধ্য হয়। উত্তরদাতা কৃষকগণ মনে করেন, ফসল উৎপাদনে কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা এবং উৎপাদিত পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ে যদি উত্তম বাজার ব্যবস্থাপনা থাকে তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। উত্তরদাতারা মনে করেন, এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বশর্ত হচ্ছে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সমঝোতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহনশীল, সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে যে তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয় তা কিছুটা নমনীয় হতে পারে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে। এই পদক্ষেপ একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় সংসদের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতাদের মতামত হচ্ছে, সরকার ও বিরোধী দল সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। বিরোধী দলের সংসদ বর্জন কর্মসূচী বাদ দিতে হবে। সংসদ বর্জন সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য একটি নেতিবাচক পদক্ষেপ। বিরোধী দল যাতে সংসদে কার্যপ্রণালী বিধি মোতাবেক কথা বলতে পারে তার ব্যবস্থা সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করাতে হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে সচল রাখার জন্য সরকার ও বিরোধী দল সংসদের ভিতরে ও বাইরে জনগণের সাংবিধানিক অধিকারকে সমুন্নত রেখে দলীয় রাজনীতির চর্চা করবেন বলে উত্তরদাতাদের প্রত্যাশা। জরিপে অংশগ্রহণকারীরা আরও মনে করেন যে, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে থাকে। সংসদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সংসদে রাজনীতিবিদ ও আইনজীবীদের অবস্থান সংকুচিত হয়ে ব্যবসায়ী অবসরপ্রাপ্ত আমলা ও সামরিক কর্মকর্তাদের আধিক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্ত পেশাজীবীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিভাজন রয়েছে। সদস্যদের এই সামাজিক বিভাজন তাদের মধ্যকার বৈরিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করে বলে গবেষণা জরিপের উত্তরদাতারা মনে করেন।

গবেষণা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক: ১৯৯১-২০০১ সময়কালের উপর একটি সমীক্ষা শীর্ষক শিরোনামের উপর একটি গবেষণা জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে কিছু প্রশ্নমালার আলোকে ১০০ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যাবলী গুণগত ও পরিমানগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নে প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

জরিপে অংশ নেওয়া বেশীরভাগ উত্তরদাতার মতামত হচ্ছে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও বিরোধপূর্ণ। দলগুলোর মধ্যে এইরূপ সম্পর্ক সৃষ্টির পেছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে সহনশীলতার অভাব। উভয় দলের নেতাকর্মীদের আচরণে সহনশীলতা কেন্দ্রীক মনোভাব গড়ে উঠেনি। এছাড়া দলগুলোর দলীয় মতাদর্শের মধ্যে বৈপরিত্য থাকার কারণে নিজেদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক বিপরীতমুখী অবস্থানে এসে দাড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় দেশ পরিচালিত হলেও সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির নিজস্ব দলীয় কর্মকাণ্ডে এবং সরকারি দল কর্তৃক বিরোধী দলের সাংবিধানিক মর্যাদায় স্বীকৃতিতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে হবে। এর জন্য সরকার ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীল আচরণ আবশ্যকীয়। জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর দায়িত্বশীলতার কোন বিকল্প নেই।

দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দলের কর্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখা। বিরোধী দল যখন সরকার বিরোধী আন্দোলনের নামে হরতাল অবরোধ আহ্বান করে তখন জনগণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গবেষণা অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে জরিপে অংশ নেওয়া উত্তরদাতাগণ হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। হরতাল অবরোধের বিকল্প হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও ও মানববন্ধন কর্মসূচীর পালন সম্পর্কিত প্রশ্নে বেশ কিছু উত্তরদাতা দেশ ও জনগণের স্বার্থে উভয় কর্মসূচী থেকে বিরোধী দলকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানান। উত্তরদাতাগণ মনে করেন, রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের উচিৎ দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জনগণের স্বার্থে নানা বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা। সরকারি দলকে এর জন্য অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সংসদের জবাবদিহিতা কার্যকর করার ক্ষেত্রেও সরকারি দলকে এগিয়ে আসতে হবে বলে উত্তরদাতারা মনে করেন।

বিরোধী দল সংসদে যোগ দিয়ে জনগণের অধিকার আদায়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে। বিরোধী দল তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ে সংসদের পাশাপাশি বাইরেও গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে পারে।

সরকার ও বিরোধী দলের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের কারণে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গতিধারা নিম্ন পর্যায়ে উপনিত হয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন। এই পরিস্থিতির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা চর্চার সংস্কৃতি বহুলাংশে দায়ী। যা ক্রমাগত সংক্রমিত হচ্ছে সামাজিক সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরে। সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসনে কর্মরত পেশাজীবী শ্রেণী এবং নিম্ন আয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত উত্তরদাতাগণ মন্তব্য করেছেন যে, সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিদ্বেষপূর্ণ, প্রতিহিংসামূলক পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক কর্মসূচী তাদের পেশাগত জীবনকে হুমকির মুখে ফেলছেন। পেশাজীবী শ্রেণীর সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ ও একই মতামত পোষণ করে বলেন যে, সরকার ও বিরোধী দলের নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মসূচী কর্তৃক তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন রয়েছে। বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত হরতাল-অবরোধ কর্মসূচী জনগণের স্বাভাবিক চলাচলের পথকে অবরুদ্ধ করেছে বারবার। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ তাদের কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতে পরিবহন সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সংকটে তাদের আর্থিক শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধন হয়েছে।

জনগণ শহরকেন্দ্রিক বড় ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচীর ঘোষণায় আতঙ্কগ্রস্থ থাকে। বিশেষ করে বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে গণগ্রেফতার ও হতাহতের আশঙ্কা তাদের দু:চিন্তাগ্রস্থ করে তোলে। এই সমস্ত জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচীতে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা বিঘ্নিত হয় চরমভাবে। শতকরা ৮৩% উত্তরদাতা বলেছেন হরতাল, অবরোধের মধ্যে অসুস্থ শরীর নিয়ে তাদের গৃহে অবস্থান করতে হয়।

দেখা গেছে রুগী বহনকারী এম্বুলেন্স সার্ভিসও হামলার স্বীকার হয়েছে এইসব কর্মসূচীতে। সে কারণেই ৮৭% উত্তরদাতারা নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করেন। এই নিরাপত্তাহীনতায় পতিত জনগণ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী এবং পুলিশ বাহিনীকে দায়ী করেছেন। নিম্ন আয়ের উত্তরদাতাগণ এই মতামত প্রকাশ করেছেন যে, প্রতিনিয়ত পুলিশী হয়রানি তাদের নাগরিক জীবনে চরম হতাশা বয়ে এনেছে।

শহরে বসবাসকারী নাগরিকদের ভোগান্তির পাশাপাশি গ্রামের কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এই রাজনৈতিক হয়রানি স্বীকার হন। কৃষকগণ মনে করেন, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে কৃষি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে দরপতন ঘটে এবং ফসল বপনের মৌসুমে কৃষি উপকরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। যার ফলে কৃষকগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

জরিপে মতামত প্রদানকারী অধিকাংশ উত্তরদাতার অভিমত হচ্ছে, দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন বিষয়টি একটি নেতিবাচক রাজনীতির পরিচয় বহন করে। বিরোধী দলের উচিৎ সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থেকে বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতা না করে গঠনমূলক বিরোধিতা করবে এবং এটি সংসদের বাইরেও সরকার বিরোধী কর্মসূচীতেও অনুসরণীয় হবে। পরিশেষে গবেষণা জরিপে ১০০% উত্তরদাতাদের অধিকাংশের মতে, সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বৈরীতামূলক। উভয় দলের এইরূপ অস্থিতিশীল রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে জনগণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দলগুলোর উচিৎ সকল মত-পার্থক্য ভুলে দেশ ও জনগণের স্বার্থে একযোগে কাজ করা। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, গবেষণার অনুকল্প প্রদত্ত গবেষণা জরিপের ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ, উপসংহার ও সুপারিশ

বর্তমান গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধান করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত এই যে, সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অর্থাৎ সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এরূপ বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এর ফলশ্রুতিতে জাতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই অনুমিত সত্যের ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে কীভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র অনেকাংশে অকার্যকর হয়ে পড়েছে সেই বিষয়টি গবেষণার প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে আবর্তীত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ফলাফল বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর্যুক্ত অনুমানের একটি বাস্তব ভিত্তি রয়েছে।

এই গবেষণায় প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার পরিধি, গবেষণার যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, এই গবেষণার অনুকল্প (Hypothesis)। গবেষণায় গৃহীত তিনটি অনুকল্প বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনাপূর্বক প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থ পর্যালোচনার অংশটিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। গ্রন্থ পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায়, এই সকল গ্রন্থে সংসদীয় গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, ঐতিহাসিক পটভূমি, সংসদীয় কার্যক্রম, সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা এবং সংসদীয় আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হলেও সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো ও কার্যক্রম, সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থানের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার সরকার ও বিরোধী দলের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদবর্গ সংসদের নিকট জবাবদিহি করে না বলে বিরোধী দলের গুরুত্বের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠে না।

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায়ই বিরোধী দল সরকারি দলের পাশাপাশি অবস্থান করে সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে।

বিভিন্ন দল ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের পর্যালোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে সাংবিধানিকভাবে বিরোধী দল স্বীকৃত হলেও একদলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের শক্তিশালী অবস্থান সুসংহত হলেও বহুদলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ীত্বের কারণে বিরোধী দলের অবস্থান দূর্বল হয়ে থাকে। গবেষণার মূল প্রশ্নের আলোকে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের বাস্তব অবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের নির্ধারকসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্পর্কের নির্ধারকসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের আইনগত অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। যার ফলে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সাংঘর্ষিক ও বিরোধিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। উক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের অধিকার সংরক্ষিত না হওয়ার বিষয়টি সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

গবেষণা কর্মের তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬১ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্মেষ এবং ধারাবাহিকভাবে এর সম্প্রসারণ ঘটলেও উপনিবেশিক শাসনামলের কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান পর্বে ১৯৫৬ সালে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হলেও শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক ও স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ এবং রাজনৈতিক দল সংগঠনের অস্থিতিশীলতার কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। এ সময়ে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ঘনঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ প্রবণতা ও সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের অধিকার সংরক্ষিত না হওয়ায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল দ্বান্দ্বিক ও বিরোধিতাপূর্ণ। যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হলেও ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রথম জাতীয় সংসদে official opposition না থাকায় সরকার ও বিরোধী দলের দলগত অবস্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ভারসাম্য পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। সেনা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনামলে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অবস্থান থাকলেও সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের আন্তঃসম্পর্ক প্রবলভাবে বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে। উভয় দলের বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা মূলত এখানেই। জিয়াউর রহমান তার সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের রূপ দিতে গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করলেও রাজনৈতিক দলগুলি তা প্রত্যাখান করে। অপরদিকে জেনারেল এরশাদ তার শাসনকে সাংবিধানিকভাবে বৈধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করলেও প্রধান রাজনৈতিক দল তাতে সাড়া দেয় নাই। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় ঐকমত্য গঠন করতে সমর্থ হয় যার ফলে এরশাদের পতন ঘটে। এরশাদ শাসনামলে চতুর্থ জাতীয় সংসদের বিরোধী দল ক্ষমতাসীন সরকারের অনুগত হওয়ায় বিরোধী দল তার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের প্রকৃতিতে সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। এছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ পূর্ব মেয়াদ অতিক্রম করতে পারেনি। সেনা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনামলের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদে সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বলা যায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক ছিল বিরোধিতাপূর্ণ।

এই গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে সরকার ও বিরোধী দলের প্রকৃত সম্পর্কের ধরন নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চম সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করতে পারেনি। কারণ পঞ্চম সংসদে মাগুরা-২ ও ঢাকা-১১ আসনের উপ-নির্বাচনে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হলে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে। জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য বিরোধী দল কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে তরান্বিত করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবির প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলের সংসদ থেকে ঘনঘন ওয়াক আউট-বয়কট পর্যন্ত গড়ায়। সর্বশেষ বিরোধী দলীয় সদস্যরা ১৯৯৪ সালে সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করলে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক হয়ে উঠে। পঞ্চম সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সদস্যরা দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। যদিও অনাস্থা প্রস্তাবটি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রমে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক নয়। সংসদের তদারকিমূলক কার্যক্রমে ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল হতাশাব্যঞ্জক। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেলেও শেষ পর্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের আন্তঃসম্পর্ক ছিল বিরোধিতামূলক।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বলা যায় যে, সরকার ও বিরোধী দলের এই বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে সরকার ও বিরোধী দলের নেতিবাচক মনোভাব কাজ করেছে।

গবেষণা কর্মটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সপ্তম সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণও তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গবেষক কর্তৃক অষ্টম জাতীয় সংসদের অধিবেশন পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের আলোকে সংসদ বিতর্কের বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের একক প্রাধান্য বজায় ছিল। সংসদে উত্থাপিত ৯৯.৪২ শতাংশ সরকারি বিলের বিপরীতে বেসরকারি বিলের হার ছিল ০.৫৮ শতাংশ। সংসদীয় তদারকিমূলক কার্যক্রম যথা, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা, জনগুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা, অর্ধঘণ্টা আলোচনা এবং মুলতবি প্রস্তাবে বিরোধী দলের প্রাপ্ত নোটিশের অধিকাংশ স্পীকার কর্তৃক বাতিল হয়ে যায়। সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের বিতর্কের আচরণ ও বিষয়বস্তু থেকে বলা যায়, সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক ছিল পরস্পর বিদ্বেষপূর্ণ। সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় স্পীকারের নিরপেক্ষতার বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জাতীয় সংসদের স্পীকার সংসদের অভিভাবক হিসেবে নিজের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেনি। সংসদীয় কমিটির সভায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকলেও সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতা না থাকায় সেটি সম্ভব হয়নি। উল্লিখিত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে গবেষণার অনুমানটি পমাণিত হয় যে, সংসদের অভ্যন্তরে সরকার ও বিরোধী দলের পরস্পরের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণের ব্যর্থতাই পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

এই গবেষণার সপ্তম অধ্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর জনগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, সে সম্পর্কে পরিচালিত গবেষণা জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা জরিপে অংশ নেওয়া শতকরা ৭৪ জন উত্তরদাতার মতে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিকতা ও বিরোধপূর্ণ। তাদের মতে এর মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে দলগুলোর মধ্যে সহনশীলতার অভাব। উত্তরদাতারা মনে করেন যে, দলীয় মতাদর্শের কারণে দলগুলোর আন্ত:সম্পর্ক বিপরীতমুখী অবস্থানে এসে পড়েছে। এর ফলে জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। উত্তরদাতাদের মতে, হরতালসহ অন্যান্য পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক কর্মসূচি তাদের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে দূর্বিসহ যাতনা নিয়ে আসে। এর ফলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি, স্বাস্থ্য ঝুকি ও পেশাগত জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। উত্তরদাতারা মনে করেন যে, বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশ কর্তৃক গণগ্রেফতার ও হতাহতের আশংকা তাদেরকে দু:চিন্তাগ্রস্থ করে তোলে। উত্তরদাতাদের এরূপ মনোভাব গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। হরতালের ব্যাপারে তাদের অভিমত হচ্ছে যে, রাজনৈতিক দলগুলো হরতালের বিকল্প হিসেবে

শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে পারে। জরিপে মতামত প্রদানকারী অধিকাংশ উত্তরদাতার পরামর্শ হচ্ছে, দেশ ও জনগণের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দলের উচিৎ হবে নানা বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। উল্লিখিত মতামত জরিপের মাধ্যমে গবেষণায় গৃহীত অনুমানটি প্রমাণিত হয় যে, সংসদের ভিতরে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘর্ষমূলক সম্পর্ক সংসদের বাইরে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর জনগণের জীবন-যাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উপরোক্ত অধ্যায়গুলির ফলাফল বিশ্লেষণ এবং গবেষণার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যার আলোকে দেখা যায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের আইনগত অধিকার সংরক্ষিত না হওয়ায় বিষয়টি কাজ করেছে। বিরোধী দলের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে স্পীকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা থাকলেও স্পীকার দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে অনেকাংশে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হননি। স্পীকার নিজেই কার্যপ্রণালী বিধি ভঙ্গ করে সংসদীয় বিতর্ক কার্যক্রমে বিরোধী দলকে প্রাপ্য সময় না দিয়ে সরকারি দলকে বেশি সময় দিয়েছেন। সংসদীয় বিতর্ক কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক মনোভাব ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক পর্যায়ে উপনীতি ছিল। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। সংসদ সদস্যগণ ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে দলীয় সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে পারস্পরিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধিতেও কিছু বৈষম্য রয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধিতে সরকারি এবং বেসরকারি বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করা হয়নি। গবেষণার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন অধ্যায়ের ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে যে কার্যকারণ নির্ণয় করা হয়েছে তার সঙ্গে সংসদের বাইরের কিছু বিষয়কে উভয় দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির মতাদর্শভিত্তিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে ৭(২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। এগুলো হলো– "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।"[১] বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ও উপরোক্ত মূলনীতির মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের বীর জনগণ মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন ও বীর শহীদগণ প্রাণ বিসর্জন দেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

রাজনীতির পরিক্রমায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রিক সেনা অভ্যুত্থানের এক পর্যায়ে ক্ষমতাসীন জেনারেল ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে গৃহীত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৭৭ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে "বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক

সুবিচার এবং ধর্মনিরপেক্ষাতাকে বাতিল করে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সকল কাজের ভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়।[৩] পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালের ১১ জন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সংবিধানের পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনী রাজনীতির অঙ্গনে মতাদর্শগত বিরোধ সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক বিপরীতমুখী অবস্থানে উপনীত হয়। সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অবস্থান জাতীয় সংসদের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করে এবং সংসদ তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের আচরণগত প্রেক্ষাপটে সামাজিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও জাতীয় সংসদ সদস্যদের পারস্পরিক আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়গুলি উপেক্ষিত। সমাজ এবং রাজনীতি একই সূত্রে গ্রন্থিত হওয়ায় সংসদ সদস্যদের সামাজিক দৈন্যতার বিষয়টি সংসদীয় সংস্কৃতিতেও সঞ্চালিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা, নেত্রীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা সরকার কর্তৃক কখনই রক্ষিত হয়নি। অথচ সাংবিধানিকভাবে বিরোধী দলের মর্যাদা স্বীকৃত। অপরদিকে এরূপ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি দল ও বিরোধী দল কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় সংসদে নিজ নিজ দলীয় আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে বায়োকনিষ্ঠ সাংসদগণ বর্ষীয়ান সাংসদদের লাঞ্ছিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে (জাসদ রব) সংসদ সদস্য ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রী আ.স.ম. আব্দুর রব বিরোধী দলীয় বিএনপির জুনিয়র এমপি আমান-উল্লাহ আমান কর্তৃক অপদস্থ হন। অধিবেশনে আমান-উল্লাহ, আ.স.ম আব্দুর রবের নাম ধরে বার বার ধমকাতে থাকেন।[৪] দৃশ্যমান বিষয়টি সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অনভিপ্রেত ছিল।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে সহনশীলতা ফরাসী বিপ্লবের যুগে জ্যা জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) 'মানুষ' শব্দের সামনে সমান চিহ্ন (=) দিয়ে লিখেছিলেন 'স্বাধীনতা' তথা ব্যক্তির স্বাধীনতা। ব্যক্তির স্বাধীনতা বলতে তিনি গণতন্ত্রের কথাই বলেছিলেন। রুশোর কথার অন্তর্গত সত্যকে সামনে এনে বলা যায় যে, গণতন্ত্র = সহনশীলতা। সহনশীলতা বাদে গণতন্ত্র হয় না এবং গণতন্ত্র বাদে সহনশীলতার দৃষ্টান্ত নেই।[৫] জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক সহনশীল নয়। নানাবিধ সংঘঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দলের সম্পর্ক অসৌজন্য ও বৈরীতামূলক পর্যায়ে পৌছায়। "অষ্টম সংসদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২১ ডিসেম্বর ২০০৫ ইং তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিএনপির মহাসমাবেশে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উত্থাপিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার হুমকি প্রদান করে।"[৬] প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য এবং হুমকি রাজনীতিতে সহনশীল সম্পর্ক স্থাপনের অন্তরায়।

সংসদ সদস্যদের সহনশীলতা বিশ্লেষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, বৃটিশ ভারতে বাংলার ছোট লর্ড লিটন তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে (১৯৪২ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Earl of Lytton, Pundits and Elephants) বঙ্গীয় আইন পরিষদ বা কাউন্সিলে মুসলমানদের পরিস্থিতি বর্ণনায় লিখেছেন, "তিন অথবা চারজন নেতার অনুসারী হিসেবে মুসলমান মধ্যপন্থীরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত ছিলেন এবং এরা কেউ কাউকে পছন্দ করতেন না।[৭] জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে অহেতুক, অপ্রাসঙ্গিক ও ন্যক্কারজনক বাক-বিতণ্ডা, পরস্পরের প্রতি কাদা ছেড়াছুড়ি, ব্যক্তিগত আক্রমণ, অতীতের দোষ-ত্রুটি ধরা ও স্ব-স্ব তথাকথিত গৌরব গাথার চর্বিত চর্বন, ইতিহাসের বিকৃতি ও সুবিধাজনক ব্যাখ্যা প্রদানের ঘটনাই ঘটে থাকে।[৮] জাতীয় সংসদ কার্যক্রমের এই সমস্ত অনাকঙ্ক্ষিত ঘটনাই সরকার ও বিরোধী দলের অবনতিশীল সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে এবং রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার প্রতিফলন ঘটেনি। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে সাংগঠনিকভাবে যদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা অব্যাহত থাকে তাহলে রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রভাব পড়ে। ভারতের গণতন্ত্র কার্যকর হওয়া সম্পর্কে W.H. Morris Jones বলেন, বৃটিশ ভারতে ১৯২০-১৯২৪ সালের মধ্যে বৃটিশ সরকার বিভিন্নভাবে একটি শিক্ষিত ও শাসন কার্যে মোটামুটি অভিজ্ঞ Political Class সৃষ্টি করেছিলেন, যারা শুধু মুখেই গণতন্ত্রের কথা বলেননি বরং গণতন্ত্রের মূল্যবোধগুলোকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সর্বোতভাবে বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন।[৯] গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে Almond এবং Verba পাঁচটি দেশের (বৃটেন, জার্মানী, ইটালী, মেক্সিকো ও আমেরিকা) উপর তুলনামূলক Civic Culture-এ দেখিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশসমূহে গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান উপাদান ছিল সেই সব দেশের Political Class-এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতি।[১০]

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও Political Class-এর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আত্মস্থীকরণ ঘটেনি। তাছাড়া উপনিবেশিক আমলের পশ্চাৎপদ সমাজ কাঠামো এখনও বিদ্যমান। স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক গোষ্ঠীর ক্রমাগত ব্যর্থ নেতৃত্বের কারণে সমাজ কাঠামো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।[১১] শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থ নেতৃত্বের কারণে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নৈতিক অবক্ষয়, নির্মম বঞ্চনা, ব্যক্তি এবং শ্রেণীর মধ্যে অসম ব্যবধান।[১২]

এই সমস্ত বৈষম্যের কারণে সমাজে দেখা দিয়েছে বিভেদ এবং হানাহানি। সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে বিস্তৃতি ঘটেছে অসহনশীল সম্পর্কের। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম স্বার্থপরতা এবং সীমাহীন আচরণগত ত্রুটি। এসব নানাবিধ কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক অঙ্গনকে করেছে সংঘর্ষপূর্ণ। উল্লিখিত কার্যকারণে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করতে না পারায় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহনশীল সম্পর্ক গড়ে উঠেনি।

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে বিরোধিতা রয়েছে, যা মতাদর্শগত বিরোধের অন্তর্গত। এরূপ বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাতে গ্রেপ্তার হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন।[১৩] ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার (মুজিবনগর সরকার) আওয়ামী লীগের নেতত্বে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান এবং সেনা বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন কর্ণেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে কার্যকরী হবে।[১৪]

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে গণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধানের প্রস্তাবনায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়[১৫] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে "Pakistan Crisis" গ্রন্থের লেখক David Loshak-এর ভাষায় ২৫ মার্চ ১৯৭১, রাত ১১.২৫ মিনিট। "যে মাত্র প্রথম গুলিটি নিক্ষিপ্ত হলো, পাকিস্তান রেডিও-এর কাছাকাছি আর একটি বেতার তরঙ্গে ভেসে এলো শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ। পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গোষণা করেছেন।[১৬] পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর সিদ্দিক সালিক তার "Witness to Surrender" গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তুলে ধরেছেন। এর শেষ বাক্যটি হচ্ছে, "যতদিন পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।[১৭] রবার্ট পেইন তার "ম্যাসাকার" গ্রন্থে জানাচ্ছেন, মাঝরাতের পরপরই, অর্থাৎ ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর টেলিগ্রাফ অফিসে তিনি বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন।[১৮] ২৬ মার্চ তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় ইস্টার্ন আর্মির চীফ অফ স্টাফ লেফটন্যান্ট জেনারেল জ্যাক জেকব "সারেণ্ডার অ্যাট ঢাকা" গ্রন্থে লিখেছেন, "২৫ মার্চ রাত এগারোটায় বাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের দিকে রওয়ানা দেয় এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর গোলাগুলি শুরু হয়। সে সময় রেডিওতে শেখ মুজিবর রহমানের একটি বার্তা শোনা যায়। তাতে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "হয়ত এটাই আমার বলা শেষ কথা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাই। বাংলাদেশের মাটিতে দখলদার একটি পাকিস্তানী সৈন্য অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে।" লেফটেন্যান্ট

জেনারেল জ্যাক জেকব তার গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন যে, ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং ২৭ মার্চ বেতার কেন্দ্র দখল করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।[১৯]

এ বিষয়টি সম্পর্কে অধ্যাপক এ.আর মল্লিক "আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং জনাব মঈদুল হাসান 'মূলধারা ৭১' গ্রন্থে লিখেছেন, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ ১৯৭১ আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান এবং ২৭ মার্চ ১৯৭১ মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।[২০] স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, "আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামরত মেজর জিয়াউর রহমান বেতার মারফত বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন।[২১] ১৯৭২ সালে ঐতিহাসিক ৭ জুন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ লক্ষ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল রাতে আমিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলাম।" তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রামের তৎকালীন ইপিআর দপ্তরে এক বার্তায় আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা জানিয়েছিলাম।[২২] স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশের ধারায় বঙ্গবন্ধু মূলত ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ১৯ মিনিটের ভাষণে জনসমক্ষে "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২৩] উচ্চারিত পঙক্তিমালার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা ঘোষণার উল্লিখিত প্রেক্ষাপটটি কেন্দ্র করে বিএনপি স্বাধীনতার প্রায় দুই দশক পর থেকে দ্বিমত পোষণ করে চলেছে। বিএনপি সংসদের ভিতরে ও বাইরে প্রচার করে যাচ্ছে যে, ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার ঘোষণার এরূপ বিতর্কটি প্রকৃতপক্ষেই রাজনৈতিক অঙ্গনে মতবিরোধের সৃষ্টি করে যা সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে।

সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সাংসদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সংসদীয় ঐতিহ্যের শুরুতে বঙ্গীয় আইন পরিষদের ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন ছিলেন বাঙালি। এরা হলেন– মৌলবী আব্দুল লতিফ, রাজা রামপ্রসাদ রায় (রাজা রামমোহন রায়ের ছেলে), রাজা প্রতাপচন্দ্র (বর্ধমানের জমিদার) এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের চাচাতো ভাই)[২৪] আইন সভায় উল্লিখিত সদস্যবৃন্দ ছিলেন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের কারণে সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্বের উপযোগী ছিলেন না। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস ও ১৯০৬ সালে

মুসলিম লীগের জন্মের মধ্যে দিয়ে উপমহাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্ববোধের বিশ্বাস থেকে সর্বসাধারণের নেতৃত্ব বিকশিত হতে শুরু করে এ সময়ে শেরে-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত জনবান্ধব নেতাদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) জনমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রামের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার আইন সভায় হিন্দু ও মুসলিম জমিদার, মুসলমান মৌলভি ও সমাজের বিত্তশালীদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হওয়ার পর দলটি গণমানুষের দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। আইন সভায় এই দলের অধিকাংশ সাংসদই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী। এছাড়া অন্যান্য দলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লীগ এর সদস্যরাও ছিলেন একই শ্রেণীভূক্ত। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।[২৫]

পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল হিসেবে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে যে কাজ করে গেছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট, ১৯৬২ সালের সংবিধানের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। স্বাধীনতা উত্তর সময়কালে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পর্যায়ে বিশেষ করে ১৯৭৫ সাল পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, সমরিক শাসনের বেসামরিকীকরণ প্রচেষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে গণবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীর পালাবাদল ঘটে। নতুন মেরুকরণে রাজনীতিতে অভিজ্ঞতাবিহীন সুবিধালোভী ব্যবসায়ী, আমলা, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাগণ নেতৃবৃন্দের আসনে সমাসীন হয়। ১৯৯০ এর গণআন্দোলনের পর সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরও রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে এই প্রক্রিয়া বজায় রয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ থেকে সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত নির্বাচিত সদস্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত অবস্থানের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণি – ৮.১

পঞ্চম থেকে সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের

শিক্ষাগত ও পেশাগত অবস্থানের তুলনামূলক চিত্র

অবস্থান		জাতীয় সংসদ	
		পঞ্চম সংসদ N = ৩৩০	সপ্তম সংসদ N = ৩৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতার অবস্থান	স্নাতকোত্তর	২৮.৮	৪০.৩
	স্নাতক	৪৩.৩	৪৫.৩
	স্নাতকের নীচে	২৭.৯	১৩.৫
	অন্যান্য	-	০.৯
পেশাগত অবস্থান	ব্যবসায়ী	৫৯.৪	৪৭.৮
	আইনজীবী	১৮.৮	১৪.৮
	চাকুরীজীবী	১৫.৫	৮.৫
	ভূস্বামী	৩.৯	৬.৯
	রাজনীতিবিদ	২.০	৩.১
	অন্যান্য	০.৪	১৮.৯

a = ১২ জন সংসদ সদস্যের তথ্য পাওয়া যায় নাই।

উৎস: Ahmed, Nizam (2002), The Parliament of Bangladesh, England: Ashgate Publishing Limited, p. 70.

সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ২৮.৮ এবং ৪০.৩ শতাংশ। স্নাতক ডিগ্রীধারী সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ৪৩.৩ এবং ৪৫.৩ শতাংশ। স্নাতকের নীচে ডিগ্রীধারী সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ২৭.৯ এবং ১৩.৫ শতাংশ। শিক্ষার শ্রেণীবিন্যাসে অন্যান্য বলতে মাধ্যমিক থেকে নিম্ন পর্যন্ত পর্যায়কে বুঝানো হয়েছে। পঞ্চম সংসদে অন্যান্য পর্যায়ের সদস্য না থাকলেও সপ্তম সংসদ এই সদস্যদের অবস্থান ছিল ০.৯ শতাংশ। উক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় সংসদে স্নাতক ডিগ্রীধারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চম সংসদের তুলনায় সপ্তম সংসদে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্নাতকের নীচে যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

উল্লিখিত সারণিতে সংসদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থানের তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৯.৪ এবং ৪৭.৮ ভাগ। পঞ্চম সংসদে আইনজীবীদের সংখ্যা ছিল ১৮.৮ ভাগ। সপ্তম সংসদে এই সংখ্যা কমে গিয়ে ১৪.৮ ভাগে পৌঁছায়। সংসদে

আইনজীবীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসদে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে মূলত সামরিক শাসনামলে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদে। এ সময়ের সেনা শাসকগণ তাদের সেনা শাসনকে বেসামরিকীকরণের রূপ দিতে রাজনৈতিক দল গঠন করে দলে ব্যাপক হারে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমাবেশ ঘটান। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এসব পেশাজীবীরা জতীয় সংসদে তাদের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করেন। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আরো সুসংহত হয়ে উঠে।

পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে চাকুরীজীবীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫.৫ এবং ৮.৫ ভাগ। ভূস্বামীদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩.৯ এবং ৬.৯ ভাগ। রাজনীতিবিদদের সংখ্যা যথাক্রমে ২.০ এবং ৩.১ ভাগ। চাকুরীজীবীদের সংখ্যা সপ্তম সংসদের তুলনায় পঞ্চম সংসদে বেশী হলেও ভূস্বামী ও রাজনীতিবিদদের সংখ্যা পঞ্চম সংসদের তুলনায় সপ্তম সংসদে বৃদ্ধি পায়। জাতীয় সংসদের ঐতিহাসিক পটভূমিতে আইনজীবী ও রাজনীতিবিদদের প্রাধান্য বজায় থাকলেও নানাবিধ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংসদে পেশাগত অবস্থানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে সাংসদের মধ্যে পেশাগত অবস্থানকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ভারসাম্যহীনতায় পতিত হয়। জাতীয় সংসদে সাংসদদের পেশাগত অবস্থানের ব্যবধানটি সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে।

সারণি – ৮.২

সংসদ সদস্যদের সংসদীয় অভিজ্ঞাতার তুলনামূলক চিত্র

সংসদীয় অভিজ্ঞতা	পঞ্চম জাতীয় সংসদ সংখ্যা – ৩৩০	সপ্তম জাতীয় সংসদ সংখ্যা – ৩১৮
নবাগত	৫৮.৫	৩৯.৫
একবারের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন	২১.৮	২৬.৭
একবারের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন	১৩.৯	৩৩.৪
প্রাপ্যতা নয়	৫.৫	--

উৎসঃ Ahmed, Nizam (2002) The Parliament of Bangladesh, England, Ashgate Publishing Company, P. 70.

সংসদীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয় বা নবাগত সংসদ সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চম সংসদে ৫৮.৮ ভাগ। সপ্তম সংসদে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৩৯.৯ ভাগে উন্নীত হয়। পঞ্চম সংসদ থেকে সপ্তম সংসদে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায় এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পঞ্চম সংসদে একবারের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যদের সংখ্যা ছিল ২১.৮ ভাগ। সপ্তম সংসদে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৭ ভাগে পৌছায়। একইভাবে

সপ্তম সংসদে একবারের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সংসদ সদস্যদের সংখ্যা যেখানে ৩৩.৪ ভাগ। পঞ্চম সংসদে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩.৯ ভাগ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একবার বা একের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সংসদ সদস্যদের সংখ্যা অনেক কম হলেও বৃটেনে এই সংখ্যা অনেক বেশী। বৃটেনে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যদের সংখ্যাই বেশী। পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশের আইন সভাতেও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যদের আধিক্য রয়েছে।[২৬]

জাতীয় সংসদে অবস্থানকারী সাংসদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতাবিহীন ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছে সর্বাধিক। এই সমস্ত বিশেষ শ্রেণীভূক্ত চাপ সৃষ্টিকারী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর আচরণে সহনশীল মনাভাব প্রদর্শনের অভাব রয়েছে। বিরোধী মতামত এখনো তাদের নিকট অসহ্য। তারা যা বোঝেন তাই সঠিক। ব্যক্তিগত বুদ্ধি দ্বারাই তারা পরিচালিত। পারস্পরিক সমঝোতা ও ঐক্য প্রক্রিয়া গঠনের মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত প্রজ্ঞার যে উন্নয়ন ঘটে সে সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। জনসাধারণের কথা বলে তারা ক্ষমতায় আসেন বটে, কিন্তু তাদের কাজকর্মে সাধারণ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলন ঘটে না। দলীয় নেতা থেকে জাতীয় নেতার স্তরে উত্তরণের কোন প্রয়াস তাদের মধ্যে নেই। তাই জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে তারা দ্বিধান্বিত হন।[২৭] রাজনৈতিক বিশ্লেষক John Barkdull বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মনোভাবের পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক বিভেদ ও দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন।[২৮]

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এ ধরনের সমস্যা আবির্ভূত হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলির অদূরদর্শীতা, একপেশে ও অনৈতিক নীতি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া রাজনীতিতে টাকার খেলা এবং পেশী শক্তির দৌরাত্ম সৃষ্টিতে দলগুলির অভিজ্ঞতা, আদর্শ ও নীতিহীন অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গও সক্রিয় ছিল। ম্যাক্স ওয়েবারের সূত্রের ভিত্তিতে "বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের কখনই যুক্তিসঙ্গত (Rational) বলা যায় না"।[২৯] অপরাজনীতির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বে হিংসা, বিদ্বেষ, পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, নীতি ও আদর্শবিহীন এক সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে অনভিপ্রেত এই সম্পর্ক জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

উপসংহার

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধিতাপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক। জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম অনেকাংশে অকার্যকর থাকায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে না উঠে বিরোধিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাতীয় সংসদের স্পীকারের নিরপেক্ষতা, সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ এবং সংসদীয় বিতর্ক কার্যক্রমে বিরোধী দলের অধিকার রক্ষিত হয়নি। সরকার ও বিরোধী দলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বিশেষ করে পাকিস্তান পর্বে দেখা যায় সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক সংসদীয় গণতন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবেশিত করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুরু হলেও প্রথম সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে জবাবদিহিতার সংকট দেখা দেয় এবং এর পরেই সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যাহত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সংসদেও সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সহযোগিতামূলক পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। এ সময়ে সেনা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় সংসদে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিত্ব সুসংহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে একটি ভারসাম্যহীন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করতে পারেনি। পঞ্চম সংসদেই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীর প্রেক্ষাপট নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক চরম বিরোধিতাপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হয়। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণেও দেখা যায় সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক নয়। সরকার ও বিরোধী দলের দান্দ্বিক ও বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে সংসদীয় কার্যক্রমের ব্যর্থতাই মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। তাছাড়া, সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কটি সংসদের বাইরে রাজনৈতিক মতভেদ, আচরণগত ও দলীয় অবস্থানগত কিছু বিষয়ের সাথেও জড়িত রয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিও মূলত সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর জনগণের জীবনযাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে, যা গবেষণা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে। পরিশেষে গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধিতাপূর্ণ ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে হলে সরকার ও বিরোধী দলের সাংবিধানিকভাবে আইনগত অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সুপারিশসমূহ হচ্ছে– সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে স্পীকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকতে হবে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ উঠিয়ে দিয়ে সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করতে হবে। সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের সমান সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া সরকার ও বিরোধী দলের দ্বন্দ্ব নিরসনে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সরকার ও বিরোধী দলের উচিৎ হবে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের আইনগত কাঠামোর আওতায় এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে নিজেদের পারস্পরিক দ্বান্দ্বিকতাকে অতিক্রম করে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা। যার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Harun, Shamsul Huda (1986), *Bangladesh Voting Behaviour, A Psephological Study 1973*, Dhaka: Univeristy of Dhaka, p. 72.

২। হক, আবুল ফজল (১৯৯০), *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৪৫।

৩। Rhaman, Ataur (1994), "Three Years of Democratic Governance in Bangladesh", *Asian Studies*, vol. 13, June, p. 18.

৪। গবেষক বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর্দায় প্রত্যক্ষ করেছেন।

৫। করিম, সরদার ফজলুল (১৯৯৫), "গণতন্ত্র এবং সহনশীলতা", *গণতন্ত্র*, জাহাঙ্গীর মুহাম্মদ (সম্পাদিত), ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১০৪।

৬। *সংবাদ*, চ্যানেল আই, রাত ৯টা, ২১ ডিসেম্বর, ২০০৫ ইং।

৭। হোসেন, শওকত আরা (১৯৯০), *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬, অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯১।

৮। হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (১৯৯২), *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকা: অক্ষর, পৃ. ৫৭।

৯। মনিরুজ্জামান, তালুকদার, "বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বর্তমান সংকট ঃ একটি বিশ্লেষণ" জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬।

১০। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-৭।

১১। চৌধুরী, হাসানুজ্জামান (২০০০), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজতন্ত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৫।

১২। আহমদ, এমাজউদ্দিন (১৯৯৩), *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট*, ঢাকা: প্রকাশক শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন, পৃ. ২১।

১৩। হক, আবুল ফজল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

১৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৯।

১৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

১৬। বেগম, খরশীদা সতীর্থ (২০০৬), *এসো সত্যাশ্রয়েঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, সত্যান্বেষণ, পৃ. ১৯।

১৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ।

১৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ।

১৯। জেকব, লে. জেনারেল জে. এফ. আর. (১৯৯৯), *সারেন্ডার এ্যাট ঢাকা*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ১৯-২০।

২০। বেগম, খুরশীদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

২১। *দৈনিক সংবাদ*, ৯ এপ্রিল, ১৯৭২।

২২। *দৈনিক সংবাদ*, ৮ জুন, ১৯৭২।

২৩। হোসেন, কামাল (২০০৫), *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, পৃ. ৬৮।

২৪। ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল (১৯৯৩), "বঙ্গীয় আইন সভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ", ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পৃ. ২৯৮।

২৫। Karim, A. K. Nazrul (1980), *The Dynamics of Bangladesh Society*, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., p. 235.

২৬। Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh*, England: Ashgate Publishing Company, p. 72.

২৭। আহমদ, এমাজউদ্দিন (২০০২), *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, পৃ. ৯৫।

২৮। Barkdull, John (2005), "Democracy Promotion in Bangladesh: The Role of Outside Actors", Golden Jubilee (1956 – 2005), *Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 50 (Humanities), p. 381.

২৯। Khan, Shahnaz, Asaduzzaman, Mahammad (1997), "The Nexus of Political & Administrative Development: The Case of Bangladesh", *Regional Studies*, vol. xv, no. 2, Spring, p. 85.

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Books

Agarwal, N. N. (1978), et.al., *Principles of Political Science*, New Delhi: Ram Chand & Co.

Ahmed, Emajuddin (1980), ed., *Bangladesh Politics*, Dhaka: Centre for Social Studies, Dhaka University.

Ahmed, Moudud (1991), *Bangladesh: Era Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: University Press Limited.

Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh*, England: Ashgate Publishing Limited.

Anthony, H. Birch (1998), *The British System of Government*, London: Routledge.

Bhuiyan, Md. Abdul Wadud (1992), *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Birch, A. H. (1966), *Representative and Responsible Government*, London: George Allen and Unwin Ltd.

Burger, Angela Sutherland (1969), *Opposition in a Dominant-Party System*, Los Angeles: University of California Press.

Choudhury, Dilara (1995), *Constitutional Development in Bangladesh Stresses and Strains*, Dhaka: University Press Ltd.

Choudhury, G. W. (2011), *The Last Days of United Pakistan*, Dhaka: UPL.

Chowdhury, Najma (1980), *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, Dhaka: University of Dhaka.

Dahl, Robert A. (1966), ed., *Political Oppositions in Western Democracies*, New Haven: Yale University Press.

___ (1967), ed., *Political Oppositions in Western Democracies*, New Haven: Yale University Press.

Dictionary of Politics (1986), London: Penguin Books.

Duverger, Maurice (1978), *Political Parties Their Organization and Activity in the Modern State*, London: University Press Cambridge.

Fartyal, H. S. (1971), *Role of the Opposition in the Indian Parliament*, Allahabad: Chaitanya Publishing House.

Finer, H. (1977), *The Theory and Practice of Modern Government*, Delhi: Surjeet Publications.

Firoj, Jalal (2012), *Democracy in Bangladesh Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Dhaka: Bangla Academy.

Garfield, Gettell Raymond (1950), *Political Science*, Calcutta: The World Press Ltd.

Garner, J. W. (1951), *Political Science and Government*, Calcutta: The World Press Pvt. Ltd.

Gidding, F. J. (1963), *Responsible State*, New Delhi: South Asia Publisher.

Hakim, Md. Abdul (2000), *The Changing Forms of Government in Bangladesh: The Transition to Parliamentary System in 1991 in Perspective*, Dhaka: Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, July.

___ (1993), *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka: University Press Limited.

Hanson, A. H. and Douglas, Janet (1972), *India's Democracy*, London: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Harun, Shamsul Huda (1984), *Parliamentary Behaviour in a Multi-National State 1947-58, Bangladesh Experience*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

___ (1986), *Bangladesh Voting Behaviour, A Psephological Study*, Dhaka: University of Dhaka.

Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: The University Press Limited.

Hossain, Golam (1988), *General Ziaur Rahman and the BNP*, Dhaka: UPL.

Islam, Sirajul (1992), ed., *History of Bangladesh 1704-1971*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Jahan, Rounaq (2005), *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Dhaka: The University Press Limited.

Jennings, Sir Ivor (1961), *Parliament*, London: Cambridge University Press.

___ (1965), *Cabinet Government*, London: Cambridge University Press.

___ (1968), *The British Constitution*, Fifth Edition, London: ELBS.

John, Ayto (1992), *Dictionary of Word Origins*, Delhi.

Kapur, A. C. (2002), *Principles of Political Science,* New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

Karim, A. K. Nazmul (1980), *The Dynamics of Bangladesh Society,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Kaul, M. N. and Shakdher, S. L. (2001), *Practice and Procedure of Parliament,* New Delhi: Lok Sabha Secretariate.

Khan, I. Shamsul (1996), et.al., *Political Culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh,* Dhaka: Academic Publishers.

Madhok, Bal Raj (1976), Opposition in the Parliament and the State Legislature, S. L. Shakdher, ed., *The Constitution and the Parliament in India,* New Delhi: National Publishing House.

Mahajan, V. D. (1991), *Select Modern Government,* New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

Maniruzzaman, Talukder (1988), *Bangladesh Revolution and Its Aftermath,* Dhaka: University Press Limited.

___ (1994), *Politics and Security of Bangladesh,* Dhaka: University Press Limited.

___ (2003), *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh,* Dhaka: Mowla Brothers.

Mannan, Md. Abdul (2005), *Elections and Democracy in Bangladesh,* Dhaka: Academic Press and Publishers.

Mehra, Ajay K. (2006), 'Historical Development of the Party System in India', Mehra, Ajay K., *Political Parties and Party System,* New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd.

Mill, John Stuart (1971), *Utilitarianism Liberty Representative Government,* London: Aldine Press, Letchworth, Herts for J. M. Dent & Sons Ltd.

Palmer, D. Norman (1961), *The Indian Political System,* London: George Allen & Unwin Ltd.

Rahman, Md. Nojibur (2000), *The Independence of the Speaker: The Westminister Model and the Australian Experience,* Dhaka: Bangladesh Institute of Parliamentary Studies.

Raphael, D. D. (1967), Human Rights Old and New, Raphael D. D., *Political Theory and the Rights of Man,* London: MacMillan.

Rashid, Harun-or (2003), *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947,* Dhaka: The University Press Limited.

Renwick, Alan & Swinburn, Ian (1983), *Basic Political Concepts*, London: Hutchinson & Co. Ltd.

Riaz, Ali (1994), *State Class & Military Rule Political Economy of Martial Law in Bangladesh*, Dhaka: Nadi New Press.

___ (2013), *Inconvenient Truths about Bangladesh Politics*, Dhaka: Prothoma Prokashan.

Rodee, C. C. (1973), ed., *Introduction to Political Science*, New York: McGrow Hill Book Company.

Rush, Michael (1986), *Political Realities Parliament & The Public*, New York: Longman Inc.

Ryle, Griffith (1989), *Parliament: Functions Practice and Procedures*, London: Sweet and Maxwell.

Sharan, P. (1965), *Political Organization and Comparative Government*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

Shorter Oxford English Dictionary (2002), New York: Oxford University Press.

Sills, David L. (1968), *International Encyclopedia of the Social Science*, New York: The MacMillan Company & The Free Press.

Wilding Norman and Laundy Philip (1961), *An Encyclopaedia of Parliament*, Revised Edition, London: Cassel and Company Ltd.

আহমদ, এমাজউদ্দিন (২০০৩), *তুলনামূলক রাজনীতিঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিমিটেড।

___ (১৯৯৬), অনুদিত, *আধুনিক রাষ্ট্র*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

___ (১৯৯৩), *বাংলাদেশ গণতন্ত্রের সংকট*, ঢাকাঃ প্রকাশক শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন।

___ (২০০২), *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ঢাকাঃ মৌলি প্রকাশনী।

___ (১৯৯২), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা*, ঢাকাঃ করিম বুক করপোরেশন।

হাসান উজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রশিদ, হারুন-অর (২০১৩), *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৭), *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

ভট্টাচার্য, নির্মল চন্দ্র (১৯৭৫), *ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

জেকব, লে. জেনারেল, জে.এফ.আর. (১৯৯৯), *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

হোসেন, কামাল (২০০৫), *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী।

হোসেন, গোলাম (১৯৯২), সম্পাদিত, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (১৯৯২), সম্পাদিত, *এরশাদের পতন বিবিসি-সহ বিদেশ গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

হান্টিংটন, স্যামুয়েল পি. (২০১১), *পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটিজ*, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী।

হাসান উজ্জামান, আল মাসুদ (১৯৯২), *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকা: অক্ষর।

আলী, সৈয়দ মকসুদ (১৯৯২), *রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তার উপমহাদেশ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হোসেন, শওকত আরা (১৯৯০), *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, ১৯২১-১৯৩৬, অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রেহমান, তারেক সামসুর (২০০২), *গণতন্ত্রের শত্রু-মিত্র: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার (২০০৩), *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা: শুভ প্রকাশন।

হক, আজিজুল (১৯৯২), *বাংলাদেশ: সমাজ রাজনীতি গণতন্ত্র*, ঢাকা: ঢাকা কম্পিউটারস।

চৌধুরী, হাসানুজ্জামান (২০০০), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজতন্ত্র*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, আবুল ফজল (১৯৯০), *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (২০০৩), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র*, ঢাকা: সাহিত্যিক।

ফিরোজ, জালাল (২০০৩), *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

ইসলাম, সিরাজুল (১৯৯৩), সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

করিম, সরদার ফজলুল (১৯৮৩), অনুবাদিত, *এরিস্টটল এর পলিটিক্স*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা।

আহমদ, মওদুদ (২০০০), *গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ (১৯৮৯), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা: রয়েল লাইব্রেরী।

হক, মোজাম্মেল (১৯৭৬), *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা: বুক হাউজ।

রহমান, মোঃ মকসুদুর (১৯৯১), *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, রাজশাহী: ইম্পিরিয়াল বুকস।

আয়েশ, উদ্দিন মুহাম্মদ (১৯৯০), *রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি*, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী।

মুহাম্মদ, জাহাঙ্গীর (১৯৯৫), সম্পাদিত, *গণতন্ত্র*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

কাসেম, মোহাম্মদ আবুল (১৯৯০), *তুলনামূলক রাজনীতি*, রাজশাহী: ডায়ামণ্ড কর্ণার।

উজ্জামান হাসান, আল মাসুদ (১৯৯১), *বাংলাদেশ, রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

Articles

Ahmed, Sabbir (2015), "Liberalism and Democracy in Bangladesh: Reflections on their Bridging", *Rethingking A Journal of Politics,* vol. 1, no. 1, January-June, Department of Political Science, University of Dhaka.

___ (1997), "National Debate on Consensus Building in Bangladesh: Issue and Approaches", *BIISS Journal,* vol. 18, no. 2, Dhaka.

Barkdull, John (2005), "Democracy Promotion in Bangladesh: The Role of Outside Actors", Golden Jubilee Volume (1956-2005), Humanities, Asiatic Society of Bangladesh, vol. 50.

Baxter, Craig and Rahman Syedur (1991), "Bangladesh Votes – 1991: Building Democratic Institutions", *Asian Survey,* vol. xxxi, no. 8, August.

Firoj, Jalal (2013), "Forty Years of Bangladesh Parliament: Trends Achievement and Challenges", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* vol. 58, no. 1 (Humanities).

Haque, A. K. M. Md. Shamsul (1997), "Parliamentary Democracy: A Theoretical Analysis", *The Journal of Social Science Review,* vol. xiv, number 2, The Dhaka University Studies, Part D.

Huntington, Samuel P. (1991), "Democracy's Third Wave", *Journal of Democracy,* vol. 2, no. 2, Spring.

Iftekharuzzaman, Rahman Mahbubur (1991), "Transition to Democracy in Bangladesh: Issues and Outlook", *BIISS Journal,* vol. 12, no. 1, January.

Islam, M. Nazrul (1995), "Parliamentary Democracy in Bangladesh: An Assessment", *Asian Studies,* vol. , no. 14, June.

Khan, Shahnaz and Asaduzzaman, Mohammad (1997), "The Nexus of Political & Administrative Development: The Case of Bangladesh", *Regional Studies,* vol. xv, no. 2, Spring.

Khan, Zillur Rahman (1997), "Bangladeshi's Experiments with Parliamentary Democracy", *Asian Survey,* vol. xxxvii, no. 6, June.

Maniruzzaman, Talukder (1992), "The Fall of the Military Dictator: 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh", *Journal of Pacific Affairs,* vol. 65, no. 2, Summer.

Rahman, Ataur (1994), "Three Years of Democratic Governance in Bangladesh", *Asian Studies,* vol. , no. 13, June.

Rahman, Mahbubur (1991), "Democracy in Bangladesh: Stresses and Strains on Constitutionalism", *The Journal of Political Science Association,* Proceedings of the Sixth National Conference.

Rashiduzzaman, M. (1978), "Bangladesh in 1977, Dilemmas of the Military Rulers", *Asian Survey,* vol. xviii, no. 2, February.

Shahidullah, Md. (2001), "Legislative Committees and Committee System in Bangladesh", *Asian Studies,* vol. 20, June.

রশিদ, হারুন-অর (১৯৮৮), "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর অবস্থান: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ", *রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা*।

মাসুম, আব্দুল লতিফ, "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র: বিএনপি শাসনামল (১৯৯১-৯৬)"।

দি জাহাঙ্গীরনগর রিভিউ, ভলিউম ৮, খণ্ড ৩, ১৯৯৬-৯৭।

Others Documents

A Guide to Political Party Development, National Democratic Institute for International Affairs, no. 1, 2001.

Barnhart, Gordon (1999), *Parliamentary Committees: Enhancing Democratic Governance,* A Report of the Commonwealth Parliamentary Association Study Group on Parliamentary Committees and Committee System, London: Cavendish Publishing Limited.

David, Butcher (2005), "Parliamentary Committees: New-Zealand Experience", Paper Presented at the International Workshop on "Parliamentary Committees in Westminister System: Lessons for Bangladesh", Organized by the SPD Project, Dhaka, 31 July 2005, SPD News Letter, No. 18, July, December, 2005.

Fair Election Monitoring Alliance (FEMA), Observation Report on Bangladesh Parliamentary Election, October 01, 2001, June, 2002.

Dhaka University Institutional Repository

Seminar On, "Parliamentary Oversight and Government Accountability in Bangladesh: The Role of the Standing Committees on Ministries", Organized by the SPD Project, Dhaka, 4 April 2004, SPD News Letter, March, 2004.

The 1997 Laurentian Seminar, "Parliamentary and the Challenges of Good Governance", Designed and Organized by the Parliamentary Centre and the Economic Development Institute of the World Bank, Montebello, Canada, July 20-30, 1997.

The Commonwealth Parliamentary Association 1991-2001: The Resurgence of Democracy, London: The Commonwealth Parliamentary Association Secretariat, 2001.

খবর, ইটিভি বাংলা, কলিকাতা, ভারত, বিকেল ৩টা, ২২/১২/২০০৫।

সংবাদ, চ্যানেল আই, ঢাকা, বাংলাদেশ, রাত ৯টা, ২১ মে ২০০৫।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬), ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পটভূমি, ২০০১।

"বাংলাদেশে সুশাসন: আইনগত ও বিচারিক প্রেক্ষাপট", বাংলাদেশ আইন সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ, ৩০ অক্টোবর, ২০০২।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহার।

সরকার অর্জিত ও বেগম দিলারা (১৯৯৬), "এক নজরে পঞ্চম জাতীয় সংসদ: নির্বাচনী রিপোর্টিং", সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

খানম, খাদিজা (২০০১), এক নজরে সপ্তম জাতীয় নির্বাচনী রিপোর্টিং, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সড), ঢাকা।

বেগম, খুরশীদা (২০০৬), সতীর্থ এসো সত্যাশ্রয়ে: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, সত্যান্বেষণ।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন রিপোর্ট, নির্বাচন কমিশন, ১৯৯৬।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন রিপোর্ট, নির্বাচন কমিশন, ২০০১।

Public Documents and Others Materials

Council Proceedings Official Report (1928), *Bengal Legislative Council, Calcutta,* Bengal Secretariat Book Depot.

Proceedings of the Bengal Legislative Council, 4 April 1918.

জাতীয় সংসদ বিতর্ক, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।

অষ্টম সংসদের ২১তম অধিবেশনের ০৪/০৫/২০০৬ কার্যদিবসের অধিবেশন পর্যবেক্ষণ।

অষ্টম সংসদের ২০তম অধিবেশনের ২৬/০২/২০০৬ কার্যদিবসের অধিবেশন পর্যবেক্ষণ।

বুলেটিন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

অষ্টম সংসদের ২৩তম অধিবেশনের সমাপনী কার্যদিবসের পর্যবেক্ষণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি (২০০১ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত)।

বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক, ১২ অক্টোবর ১৯৭২।

ভূইয়া মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (১৯৯৬), সম্পাদিত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ।

প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।

সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের ৩৭তম বৈঠকের সরকারি প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

পূর্ব বাংলা আইন সভা বিতর্ক, ২৭ মার্চ ১৯৫৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (২০০৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)

সংবাদপত্র

দৈনিক সংবাদ, ৯ এপ্রিল ১৯৭২।

দৈনিক সংবাদ, ১১ এপ্রিল ১৯৭২।

দৈনিক সংবাদ, ১২ এপ্রিল ১৯৭২।

দৈনিক প্রথম আলো, ২০ জুন ২০০৬।

দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ মে ২০০৬।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জুন ২০০০।

দৈনিক সংবাদ, ৮ জুন ১৯৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক আমার দেশ, ৬ এপ্রিল ২০০৫।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ অক্টোবর ২০০১।

দৈনিক সংবাদ, ৪ অক্টোবর ২০০১।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২০ এপ্রিল ১৯৭৯, ঢাকা।

The Daily Star, 3 October 2001.

The Bangladesh Observer, 4 October 2001.

The Bangladesh Observer, 3 October 2001.

The Daily Star, 3 October 2001.

Periodicals

Asian Studies, Journal of the Department of Government and Politics, Jahangirnagar University, Dhaka.

Asian Survey, Berkeley, USA.

BIISS Journal, Dhaka.

Far Eastern Economic Review, Hong Kong.

Journal of Democracy, USA.

Journal of Pacific Affairs, USA.

Journal of Social Science Review, The Dhaka University Studies.

Regional Studies, Dhaka.

Rethinking: A Journal of Politics, Department of Political Science, University of Dhaka.

The Jahangirnagar Review.

The Journal of Political Science Association, Dhaka.

The Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities), Dhaka.

Weekly Dhaka Post, Dhaka

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ.ডি. ও এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

Hossain, Mohammad Sohrab, Role of Opposition in Democratic Politics: A Study with Special Reference to Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2006), Ph.D Thesis, Department of Political Science, Dhaka University.

Rahaman, Mohammad Mahabubur, The Role of Jatiya Sangsad in the Democratization Process of Bangladesh (1991-2013), Ph.D. Thesis, Department of Political Science, Dhaka University.

আলম, মোঃ শামছুল, সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের সংকট: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০০৫।

চৌধুরী, শরীফ আহমদ (২০০৭), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬), জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ১

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক: ১৯৯১-২০০১ সময়কালের উপর একটি সমীক্ষা জরিপের প্রশ্নমালা

১। নাম ঃ

২। জন্ম তারিখ ঃ

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৪। পেশা ঃ

৫। ধর্ম ঃ ☐ ইসলাম ☐ হিন্দু ☐ খ্রিস্টান ☐ বৌদ্ধ

৬। লিঙ্গ ঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা

১। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দরের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও বিরোধপূর্ণ?
☐ হ্যাঁ ☐ না

২। সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক সহনশীলপূর্ণ নয় বলে কি আপনি মনে করেন?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৩। রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় মতাদর্শ সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৪। রাজনৈতিক দলগুলির দলীয় কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় কি?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৫। আপনি কি মনে করেন জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত হতে পারে?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৬। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে যে হরতাল আহ্বান করা হয় তার জন্য আপনি কি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৭। আপনি কি মনে করেন হরতালের কারণে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৮। আপনি কি মনে করেন হরতালের কারনে শিক্ষাব্যবস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে?
☐ হ্যাঁ ☐ না

Dhaka University Institutional Repository

৯। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কি হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার করা উচিত?
□ হ্যাঁ □ না

১০। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভিন্নমত প্রকাশের জন্য হরতাল ও অবরোধের বিকল্প হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট, ঘেরাও ও
মানব বন্ধন কর্মসূচিকে আপনি কি সাপোর্ট করেন?
□ হ্যাঁ □ না

১১। রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য সরকার ও বিরোধী দলকে নানা বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে?
□ হ্যাঁ □ না

১২। আপনার কি মনে হয় সংসদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি দলের ভূমিকা রয়েছে?
□ হ্যাঁ □ না

১৩। বিরোধী দল তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী সফল করার জন্য সংসদের ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন করতে পারে?
□ হ্যাঁ □ না

১৪। বিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান নিম্ন পর্যায়ে উপনিত হয়েছে?
□ হ্যাঁ □ না

১৫। সরকার ও বিরোধী দরের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণে আপনার পেশাগত বিষয়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?
□ হ্যাঁ □ না

১৬। বিদ্যমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে আপনার ব্যবসার কি কোন ক্ষতি হয়েছে?
□ হ্যাঁ □ না

১৭। অস্থিতিশীল রাজনেতিক পরিবেশ অর্থাৎ হরতাল অবরোধ না থাকলে আপনার ব্যবসা বণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভবান হন?
□ হ্যাঁ □ না

১৮। রাজনৈতিক সহিংসতা থাকলে আপনি কি স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারেন?
□ হ্যাঁ □ না

১৯। সরকারের বিরোধীতা করতে গিয়ে বিরোধীদলের ডাকা অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচী আপনার নাগরিক জীবনকে কি অশান্ত করে তুলেছে?
□ হ্যাঁ □ না

২০। শহর কেন্দ্রিক বড় ধরণের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী আপনাকে দু:চিন্তাগ্রস্ করে তুলে?
□ হ্যাঁ □ না

Dhaka University Institutional Repository

২১। হরতাল অবরোধ চলাকালে আপনি কি স্বাভাবিক চিকিৎসা সেবা নিতে পারেন?
□ হ্যাঁ □ না

২২। হরতাল অবরোধ চলাকালে আপনি কি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন?
□ হ্যাঁ □ না

২৩। হরতাল অবরোধ থাকলে আপনি কি উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারেন?

২৪। দীর্ঘ মেয়াদী হরতাল অবরোধ চলাকালে কৃষি উপকরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা যায়?

২৫। রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশ বজায় থাকলে আপনি কি দু:চিন্তাগ্রস্থ থাকেন?

২৬। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়?

২৭। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

২৮। সংসদ বর্জন সংস্কৃতি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে কতটুকু নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে বলে মনে করেন?

২৯। জাতীয় সংসদের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

৩০। আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংসদের ভিতরে ও বাইরে রাজনৈতিক দলগুলির কি ধরনের ভূমিকা পালন করা উচিত?

৩১। সংসদ সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থান, সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কে কতটুকু প্রভাবিত করে থাকে?

৩২। বাংলাদেশের একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বির্ণিমানে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলি কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একটি রূপরেখা

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম
শুরু হওয়ার তারিখ	৭.৪.১৯৭৩	২.৪.১৯৭৯	১০.৭.১৯৮৬	২৫.৪.১৯৮৮	৫.৪.১৯৯১	১৯.৩.১৯৯৬	১৪.৭.১৯৯৬
সংসদ নেতা	শেখ মুজিবর রহমান	শাহ আজিজুর রহমান	মিজানুর রহমান চৌধুরী	মওদুদ আহমদ	বেগম খালেদা জিয়া	বেগম খালেদা জিয়া	শেখ হাসিনা
সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা	কেউ না	আসাদুজ্জামান খান	শেখ হাসিনা	আ. স. ম. আব্দুর রব	শেখ হাসিনা	কেউ না	বেগম খালেদা জিয়া
সর্বমোট সেশন	৮	৮	৪	৭	২২ (২০টি সেশনে বিরোধী দল উপস্থিত ছিল)	১	৯ ৯ জুলাই ১৯৯৮ পর্যন্ত
সর্বমোট পাশকৃত আইনের সংখ্যা	১৫৪	৬৫	৩৮	১৪২	১৭২	১	৬০ (জুন ১৯৯৮ পর্যন্ত)
সর্বমোট কার্য দিবস	১৩৪	২০৬	৭৫	১৬৮	৪০০ (বিরোধী দলের উপস্থিতিসহ ২৪২)	৪	১৮৯ (নবম সেশন পর্যন্ত)
সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার তারিখ	৬.১১.১৯৭৫	২৪.৩.১৯৮২	৬.১২.১৯৮৭	৬.১২.১৯৯০	২৪.১১.১৯৯৫	৩০.৩.১৯৯৬	

উৎস: Hasanuzzaman, Al Masud, op.cit., p. 242 থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ৩

বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থার সময়কাল এবং প্রকৃতি

সময়কাল	শাসনামলের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ থেকে মার্চ ৬, ১৯৭৩ পর্যন্ত	অস্থায়ী সরকার বহুদলীয় গণতন্ত্র	১ বৎসর ৩ মাস
মার্চ ৭, ১৯৭৩ থেকে ডিসেম্বর ২৭, ১৯৭৪ পর্যন্ত	বহুদলীয় গণতন্ত্র	১ বৎসর ৯ মাস
ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭৪ থেকে জানুয়ারি ২৫, ১৯৭৫ পর্যন্ত	জরুরী অবস্থা	১ মাস
জানুয়ারি ২৫, ১৯৭৫ থেকে আগস্ট ১৫, ১৯৭৫ পর্যন্ত	শেখ মুজিবর রহমানের একদলীয় শাসন	৭ মাস
আগস্ট ১৫, ১৯৭৫ থেকে নভেম্বর ৭, ১৯৭৫ পর্যন্ত	সামরিক শাসন	২ মাসেরও বেশি
নভেম্বর ৭, ১৯৭৫ থেকে মে ৩০, ১৯৮১ পর্যন্ত	সামরিক শাসন এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সেনা-নিয়ন্ত্রিত বেসামরিক শাসনামল	৬ বৎসর ৬ মাস
মে ৩০, ১৯৮১ থেকে মার্চ ২৪, ১৯৮২ পর্যন্ত	আব্দুস সাত্তারের অন্তর্বর্তীকালীন শাসনামল	১০ মাস
মার্চ ২৪, ১৯৮২ থেকে ডিসেম্বর ৬, ১৯৯০ পর্যন্ত	জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক শাসন, সেনা-নিয়ন্ত্রিত বেসামরিক শাসনকে অনুসরণ করে	৮ বৎসর ৯ মাস
ডিসেম্বর ৬, ১৯৯০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২৭, ১৯৯১ পর্যন্ত	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামল	১ মাসেরও বেশি
ফেব্রুয়ারি ২৭, ১৯৯১ থেকে মার্চ ৩০, ১৯৯৬ পর্যন্ত	বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বহুদলীয় সংসদ (৬ আগস্ট ১৯৯১ থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন)	৫ বৎসরেরও বেশি
মার্চ ৩০, ১৯৯৬ থেকে জুন ২৩, ১৯৯৬ পর্যন্ত	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামল	২ মাসেরও বেশি
জুন ২৩, ১৯৯৬ থেকে জুলাই ১৫, ২০০১ পর্যন্ত	শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বহুদলীয় সংসদ	৫ বৎসর
জুলাই ১৫, ২০০১ থেকে অক্টোবর ৯, ২০০১ পর্যন্ত	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামল	২ মাসেরও বেশি
অক্টোবর ১০, ২০০১ থেকে অক্টোবর ২৮, ২০০৬ পর্যন্ত	খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৫ বৎসর

উৎস: Riaz, Ali, *op.cit.*, p. 10 (see Inconvenient Truths About Bangladesh Politics, 2013) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।